সাজবদল

সাজবদল

রণজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ
১৩৬৮

॥ এক ॥

ট্যাক্সি থেকে নেমে শান্ত প্রায় এক এক লাফে দু তিনটে সিঁড়ি পার হয়ে ফ্ল্যাটের দিকে উঠতে থাকে। ভোরের রেশ কেটে গেছে। অন্যান্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ কেউ উঠে পড়েছে। বর্ধমান থেকে হাওড়া কতটুকুই বা পথ! তবু যেন মনে হয় অনেকখানি। পকেট থেকে চাবি বার করে কোলাপসিবল গেটের দরজা খোলে। ভেতরে ঢুকে আবার বন্ধ করে দেয়। নিস্তব্ধ ফ্ল্যাট। দরজা খুলে নিজের ঘরখানাকে একবার দেখে। বাইরে থেকে ভোরের ছিটকে আসা আলোয় কেমন যেন মায়া সৃষ্টি করে। দরজায় পিঠ দিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে শান্ত। একটা মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে আছে সারা ঘরে। একটা ক্লান্তির নিশ্বাস ছেড়ে রাস্তার দিকের জানালা দুটো খুলে দেয়। সামনে সেণ্টার টেবিলে প্রায় তিনমাস আগেকার জ্বালানো ধূপকাঠি। জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে গেছে। ছড়িয়ে থাকা গন্ধটা তারই। জামা-কাপড় ছেড়ে বাথরুমে ঢোকে। সাবানটা শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে। চোখে মুখে জল দেয়, সাবান মাখে। প্রমাণ সাইজ আয়নার সামনে নিজেকে দাঁড় করায়। এক দৃষ্টে নিজের দিকে চেয়ে থাকে। আয়নার শান্তকে জিজ্ঞাসা করে—কেমন আছো? কি দেখছো? উত্তর আসে—ভালই তো। আর দেখছি তোমাকে।

শান্ত হাসতে থাকে। নিজেকে দেখতে খুব ভাল লাগে। প্রতিবিম্বকে চোখ মারে। প্রতিবিম্বও প্রত্যুত্তর দেয়। হঠাৎ দারুণ হাসি পায় শান্তর। নিঃশব্দ হাসি থেকে বাড়তে বাড়তে প্রচণ্ড হাসিতে

ফেটে পড়ে। তারপরেই মনে হয় এত জোরে হাসা ঠিক হচ্ছে না। এখনও সে শান্ত মৈত্রতে ফিরে আসেনি। এখনও তার নাম শুভ্রাংশু সেন। কিংসওয়ে করপোরেশনের একাউন্টেন্ট। বর্ধমানের জানকীনাথ মিত্রের জামাই এবং তার একমাত্র মেয়ে বীথি মিত্রের স্বামী। ডান হাতটা মুখের কাছে তুলতেই অনামিকার আংটিটা ধ্বক করে জ্বলে ওঠে! স্মৃতিতেও একটা বৈদ্যুতিক শিহরন খেলে যায়।…

শুভ্রাংশুর মাথা কোলে নিয়ে বীথি আস্তে আস্তে মুখটা নামিয়ে আনে। নাক দিয়ে আদর করতে করতে বলে—কোনদিন কল্পনাই করতে পারিনি তোমার মত বর পাব।

—ভেবে নাও পাওনি। শুভ্রাংশু আস্তে আস্তে জবাব দেয়।

নাকটা কামড়ে ধরে বীথি আরও একবার আদর করে। নিজের নাকটা শুভ্রাংশুর সারা মুখে ঘষতে ঘষতে বলে—পেয়ে কি আর না পাওয়ার কথা ভাবতে পারি? যেদিন থেকে বুঝতে শিখেছি আমি একটা মেয়ে, আমার বিয়ে হবে, একটি পুরুষ আসবে আমার জীবনে, সে আমাকে ভালবাসবে, তার সুখ-দুঃখের সাথী করে নেবে, সেদিন থেকে তাকেও কিছু একটা দেবার জন্য আমি টিফিন বাঁচিয়ে পয়সা জমাতাম। তারপর যেদিন তোমার সাথে আমার বিয়ে ঠিক হল, সেদিন আমি নিজে গিয়ে এই আংটিটা কিনে এনেছি। হাতটা দাও, পরিয়ে দিই।

বীথি শান্তর হাতটা টেনে নেয়। অনামিকায় পরিয়ে দেয় আংটিটা। হাতটা অনেকক্ষণ নিজের গালের সাথে চেপে ধরে রাখে। অস্ফুট স্বরে বলে—এ আংটিটা তুমি কোনদিন হাত থেকে খুলবে না।

শান্তর চোখে বিহ্বলতা। হয়ত একটু করুণাও। ওর তন্ময়তা ভেঙ্গে বীথি আবার বলে—বলো খুলবে না!

—খুলবো না। ঋজু গলায় উত্তর দেয় শুভ্রাংশু।

বীথি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুকে। আনন্দের আতিশয্যে বলতে থাকে—তোমাকে আমার খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

শুভ্রাংশু হাসে। বীথি এ হাসির মানে বুঝতে পারে না।

সেই হাসি! সম্পূর্ণ উলঙ্গ শান্ত তাকিয়ে আছে প্রতিবিম্বের দিকে। ঠোঁট দুটো আয়নায় চেপে ধরে প্রতিবিম্বকে চুমু খায়।

ফিসফিস করে বলে—শুভ্রাংশু সেন মারা গেছে। বীথি এখন আর তোমার কেউ নয়।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে শান্ত ঘরে ঢোকে। পুরানো স্যুটকেসটা খুলতেই খানিকটা হাওয়া বেরিয়ে যায়। ঠিক বীথির নিশ্বাসের মতো। বিরক্তিতে মুখখানা কুঁচকে ওঠে। বীথির কথা বড্ড বেশী মনে পড়ছে। জামা-প্যান্টগুলো একটা একটা করে তুলতে থাকে। পুরানো পোশাক। আবার শান্ত মৈত্রতে ফিরে আসা। ঘরটাতে এখন ও সম্পূর্ণ একা। সুতরাং পোশাক পরার কোন দরকার নেই। ক্লান্ত শরীরটাকে টান টান করে খাটের ওপর ছড়িয়ে দেয়। জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হলো। কাল থেকে আবার অন্য জীবন।

দারুণ ঘুম পাচ্ছে। সেই সাথে ভেসে উঠছে বীথির মুখ। এতক্ষণে আদরে আদরে পাগল করে তুলতো। তিন মাসে অভ্যাসটা খারাপ হয়ে গেছে। একা শুলে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। পরমুহূর্তেই নিজের ওপর বিরক্তিতে মনটা ভরে যায়। দুর্বলতার কোন ক্ষমা নেই। শান্তর ঘুম আসছে। পরম নিশ্চিন্ত একটা ঘুম চাই।

মাছির মত নানা রকম চিন্তা মাথার মধ্যে ভনভন করছে। অনেক চেষ্টা করেও তাড়াতে পারছে না। পিউ কেমন আছে কে জানে। পিউর কথা মনে হতেই মিঃ বোহরার কথা মনে পড়ে। এমপ্লয়মেণ্ট একস্‌চেঞ্জের চত্বর থেকে সুধীর হালদার ওকে এনে দাঁড় করিয়েছিল মিঃ বোহরার সামনে।

—কাজ তোমাকে একটা দিতে পারি। শর্তও সোজা। একটু গোপনীয়তা বজায় রেখে চলতে হবে। মাঝে মাঝে নিজের বুদ্ধি খাটাতে হবে। তবে কোন পিছুটান থাকলে চলবে না।

—পিছুটান মানে?

—মানে কোন মেয়েকে ভালবাসা-টাসার ব্যাপার আর কি। মোদ্দা কথা সেন্টিমেণ্ট ব্যাপারটাই এখানে অচল। কাজটাকে কাজ হিসেবে নিতে হবে। পারবে?

বেলেঘাটার এক অন্ধকার গলির ছোট্ট একটা বাড়িতে পিউ হয়ত আজও পথ চেয়ে বসে আছে। ও নিজের মনেই বলে ওঠে—পিউ, বিশ্বাস করো, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় আমি কাজটা নিয়ে নিয়েছি।

পিউর কথা মনে হতেই শান্ত নিজের উলঙ্গ শরীরটাকে চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলে। বিনয়ের সুরে অনুরোধ করে—পিউ, প্লিজ তুমি এখন যাও। আমাকে একটু ঘুমুতে দাও। আমি বড় ক্লান্ত পিউ। তোমার ছবিটা এখনও আমার কাছে আছে। তুমি তো আমার কাছেই আছো। হাই তোলে শান্ত। চোখের পাতা ক্রমশঃ ভারী হতে থাকে। এক সময় শান্ত এলোমেলো চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলে ঘুমিয়ে পড়ে।

॥ দুই ॥

—এসো তপন, ভেতরে এসো। মিঃ বোহরা পরিষ্কার বাংলায় তপনকে অভ্যর্থনা জানান। তপন ভেতরে ঢোকে। পুরো নাম তপন দাশগুপ্ত। কালো কোঁকড়ানো একমাথা চুল। আঁচড়ানোর প্রয়োজন হয় না। চোখে ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ঘন ভ্রূর নীচে চোখদুটো সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিঃ বোহরার অনুরোধে তপন সামনের চেয়ারে বসে।

—তোমার দুটো কাজই সুন্দরভাবে হয়েছে। অনেক ধন্যবাদ। মাসখানেক তোমার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। তোমার একাউণ্টে বাইশ শ' টাকা আছে। পুরোটাও নিতে পার, পার্ট পেমেণ্টও নিতে পার। এ ছাড়া তুমি কোথাও বেড়াতে যেতে চাইলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। বলো তোমার কি ইচ্ছে?

—টাকাটা পুরো চাই। আর আপাততঃ কোথাও বেড়াতে যাবার ইচ্ছে নেই। ভাবছি একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসবো।

মিঃ বোহরা ইণ্টারকম ডায়াল করে দাশবাবু নামক জনৈক ভদ্রলোককে বাইশ শ' টাকা আনতে বলেন। দাশবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তপন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—এই একমাস কি বাড়িতেই থাকবে? মিঃ বোহরা প্রশ্ন করেন।

—তাই ইচ্ছে আছে।

—মাঝে মাঝে এখানে চলে এসো। ইজিপটে তোমার একজন ক্যাণ্ডিডেট ছাড়াও আরও দুজন এসেছে। তাদের সাথে দু' একটা রাত কাটাতে পার। সুন্দরী যুবতী। মনে হয় তোমার ভালই লাগবে।

—ঠিক আছে, বাড়িতে ভাল না লাগলে চলে আসবো। ধন্যবাদ।

তপন নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে মিঃ বোহরা ডাকেন—তপন!

তপন পেছন ফিরে চায়। মোটা ফ্রেমের চশমার নীচে মিঃ বোহরার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে। সিগারেটের ছাই এসট্রেতে ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন—আজ সন্ধ্যের দিকে একবার ক্লাবে এসো। একটু দরকার আছে।

—আসবো। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না।

—ঠিক আছে।

তপন স্যুয়িং ডোর ঠেলে বেরিয়ে যায়। মিঃ বোহরার চোখে একটা ক্রূর হাসি খেলে যায়। এমন সময় টেলিফোনটা বেজে ওঠে।

—বোহরা স্পিকিং।

—আমি শেলী ট্যাণ্ডন কথা বলছি। আজ বাপী আসবেন। আমাদের ইংলিশ নাটকের ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলতে চান।

—হাউ নাইস! কখন আসছেন উনি?

—সাড়ে ছ'টা নাগাদ। আপনি থাকবেন তো?

—নিশ্চয়ই থাকবো।

—ছাড়ছি। বাই।

—বাই বাই।

টেলিফোনটা ক্রেডেলে রেখেই আবার তুলে নেন মিঃ বোহরা, একটা নাম্বার ডায়াল করেন। ওপাশ থেকে উত্তর আসে সি. সি. এ. মিসেস বোহরা কথা বলছি।

—শোন, আজ সন্ধ্যেবেলা মিঃ ট্যাণ্ডন, আই মিন একজন গ্রেট বিজনেস ম্যাগনেট আসবেন। একটু ভালো স্ন্যাকসের ব্যবস্থা রেখো।

—রাখবো। আর কিছু?

—আর আমাদের এক নম্বর গেস্ট হাউসের তিন নম্বরকে একটু সেজেগুজে থাকতে বলবে মিঃ ট্যাণ্ডনকে একটু আপ্যায়ন করতে হবে আর কি।

—ঠিক আছে।

—ধন্যবাদ।

রিসিভারটা যথাস্থানে নামিয়ে রেখে মিঃ বোহরা একটা ফাইলে মনোনিবেশ করেন। কিংসওয়ে করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেকটর মিঃ বোহরা তখন পুরোপুরি একজন বিজনেসম্যান। তাঁর কথাবার্তা চলাফেরা এবং আদব-কায়দায় একজন ধুরন্ধর ব্যবসায়ীর ছাপ। জীবনে তাঁর একটি মাত্রই শখ, টাকা রোজগার করা। জীবনে অনেক উত্থান পতন এবং অসীম দারিদ্র্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি জেনেছেন, পৃথিবীতে টাকাটাই সব। টাকা দিয়ে স্নেহ মায়া মমতা এমনকি ভালোবাসাও কেনা যায়। তাই টাকাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। টাকার জন্য তিনি সব কিছু করতে পারেন। পুরুষের চরিত্র, নারীর সতীত্ব এসব শুনলে তিনি হো-হো করে হেসে ওঠেন। মনে মনে চ্যালেঞ্জ নিয়ে চরিত্রের এবং সতীত্বের বড়াই করে যারা তার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়, তাদের মাথা তিনি নুইয়ে দেন।

মিসেস সীমা বোহরা ছিল মিঃ বোহরার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুরিন্দর সিং-এর স্ত্রী। একদিন কথায় কথায় নিতান্ত পরিহাসচ্ছলে মিঃ বোহরা বলেছিলেন—পৃথিবীতে টাকাটাই সব। সীমা প্রচণ্ডভাবে সে কথার প্রতিবাদ করে। প্রতিজ্ঞা ভরা গভীর চাহনিতে সীমা সেদিন বলেছিল—পৃথিবীতে টাকার চাইতেও বড় ভালোবাসা।

মিঃ বোহরা সেদিন শুধু একটু হেসেছিলেন।

—সীমা, তুমি আমার সাথে চ্যালেঞ্জ কর না! টাকার কাছে ভালবাসাও মাথা নোয়ায়।

—কক্ষনো না। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি। আপনি আমাকে টাকা দিয়ে বশ করুন তো?

—তোমাকে আবার বলছি, চ্যালেঞ্জ করো না।

—আপনি কিন্তু গায়ের জোরে আপনার মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন।

—ঠিক আছে সীমা, আমি প্রমাণ করবো ভালোবাসার থেকে টাকা বড়। কিন্তু একটা কথা, আমাদের এই চ্যালেঞ্জ পৃথিবীর তৃতীয় কেউ জানতে পারবে না। এমনকি সুরিন্দরও না। তোমার মর্যালিটির ওপর এই বিশ্বাসটুকু রাখতে পারি?

—আপনার সব কথা আমি মেনে নিলাম। আবেগবিহ্বলা সীমা উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে প্রতিজ্ঞা করে ফেললো। আরও বললো—আপনি যদি পারেন আমি সারাজীবন আপনার দাসী হয়ে থাকবো।

হেসে ওঠেন মিঃ বোহরা—তুমি আমার দাসী হবে কেন, হলে তুমি আমার রানী হয়ে থাকবে।

অবজ্ঞার হাসি ফুটে ওঠে সীমার দু'চোখে। সুরিন্দরকে ও ভাল করেই জানে। পাঞ্জাবী তনয় সুরিন্দর সিং সীমার জন্য পৃথিবীর যে কোন ত্যাগকে গ্রহণ করতে পারে। আর সীমা···পৃথিবীর সমস্ত সুখ ঐশ্বর্যের দিকে অবহেলায় তাকিয়ে সুরিন্দরের চওড়া বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

তা ছাড়া একটা চরম সত্য জানবার আগ্রহও আছে। দেখাই যাক না ভালোবাসা জেতে না টাকা পয়সা!

—চ্যালেঞ্জ যখন নিয়েছো, আশা করি তুমি পিছু হটবে না। আরও একটা কথা, এই চ্যালেঞ্জে হারা মানে তোমার জীবনেও তার প্রভাব সাংঘাতিক। সে আঘাত সইবার মতো মানসিক জোর তোমার আছে তো? পরে কিন্তু আমাকে দোষারোপ করতে পারবে না। আমি সুরিন্দরের বন্ধু। শত্রু নই।

—কোন ভয় নেই মিঃ বোহরা, আপনার চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম। তার জন্য আমার জীবনের সমস্ত ক্ষতি মেনে নিতেও আমি প্রস্তুত। আর পৃথিবীর তৃতীয় কোন প্রাণী আমাদের চ্যালেঞ্জের কথা জানবে না।

—উইশ ইউ গুড লাক্।

॥ তিন ॥

কসমোপলিটান কালচারাল এসোসিয়েশন। মিঃ এবং মিসেস বোহরা অপেক্ষা করছেন।

—তোমাকে যেন একটু উত্তেজিত মনে হচ্ছে? সীমা আলতো করে প্রশ্ন করে।

—ঠিক উত্তেজিত নই, একটু চিন্তিত বলতে পারো। মিঃ ট্যাণ্ডনকে ঠিক বুঝতে পারছি না। পরে তোমাকে সব বুঝিয়ে বলবো, আগে আমাকে ব্যাপারটা বুঝতে দাও।

কলিং বেল বেজে ওঠে। মিঃ বোহরা সীমাকে চোখের ইশারা করতেই সীমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মিঃ বোহরা ড্রইং-রুম থেকে বারান্দায় আসতেই দেখেন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে শেলী এবং একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

—হ্যালো শেলী, গুড ইভনিং।

—গুড ইভনিং। আসুন, আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমার বাবা মিঃ রমেশ ট্যাণ্ডন আর বাবা, ইনি মিঃ বোহরা আমাদের সি. সি.-এর একমাত্র কর্ণধার।

ওঁরা দুজনে সৌজন্যসূচক করমর্দন করেন। বিনীত ভাবে মিঃ বোহরা বলেন—আসুন মিঃ ট্যাণ্ডন। আপনার মতো লোকের উপস্থিতিতে গর্ব অনুভব করছি।

—না না, এতে গর্বের কি আছে! আপনি বলেই সি. সি.-এর মতো একটা সুন্দর অর্গানাইজেশন চালাতে পারছেন। ভালো এসোসিয়ে-

শনের সত্যিই খুব অভাব। শেলী তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এখানে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য থেকে পপ সং পর্যন্ত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এমন সংমিশ্রণ বড় একটা দেখা যায় না। সত্যিই প্রশংসনীয়।

—ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে নানা ভাষাভাষির সভ্য-সভ্যারা আছে তো তাই আমাকে সব কিছুরই ব্যবস্থা রাখতে হয়। এ ছাড়া নানারকম খেলাধুলার ব্যবস্থাও আছে।

—আপনি একা সব কিছু সামলান কি করে?

—অসুবিধাই হতো যদি আমার স্ত্রী আমাকে সাহায্য না করতেন।

—তিনি কোথায়?

—দাঁড়াও বাপী, আমি ডেকে আনছি। শেলী ছুটে ভেতরে চলে যায়।

—শেলী এখানে খুব ঘরোয়া হয়ে গেছে মনে হচ্ছে? মিঃ ট্যাণ্ডন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেন।

—নিশ্চয়ই। শেলী আমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে গেছে বলতে পারেন।

—নমস্কার। মিসেস বোহরা ঘরে ঢুকে মিঃ ট্যাণ্ডনকে অভিবাদন জানান।

—নমস্কার। আসুন আসুন। মিঃ ট্যাণ্ডন প্রত্যভিবাদন জানালে সীমা এসে একটা সোফায় বসে।

—শেলী অনেকদিন থেকেই আমাকে একবার এখানে আসতে বলছে, কিন্তু আমার সময়ের এত অভাব যে···

কথা শেষ করতে না দিয়ে মিঃ বোহরা বলে ওঠেন—আপনাকে আরও আগে আমাদের মধ্যে পেলে আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারতাম। যাই হোক, বেটার লেট দ্যান নেভার।

—শেলীর খুব ইচ্ছে, সি. সি. এ.র সভ্যরা মিলে একটা ইংরাজী নাটক করবে। আমারও ইচ্ছে একটা ইংরাজী নাটক হোক।

—আপনাদের যখন ইচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই হবে। মিঃ বোহরা বিনীতভাবে বলেন।

—বাই দ্য ওয়ে আপনার মিসেসকে আমার খুব চেনা চেনা লাগছে। মনে হচ্ছে আগে কোথাও দেখেছি। মিঃ ট্যাণ্ডনের কথায় কৌতূহল।

এতক্ষণ কথা বলার সময় সীমারও মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক যেন বেশ চেনা চেনা। অথচ কিছুতেই মনে আসছে না কোথায় কখন দেখা হয়েছিল।

—মিঃ বোহরার সাথে বিয়ে হবার আগে আপনি কোথায় থাকতেন মিসেস ?

প্রশ্নটা শুনে সীমা যেন চমকে উঠলো। আমতা আমতা করতেই মিঃ বোহরা তাড়াতাড়ি জবাব দেন—বিয়ের আগে ও বম্বেতে ছিল।

—বম্বে ? দুঃখিত। তাহলে আমি ভুল করেছি। অবশ্য এক রকম দেখতে দুটো মানুষ অনেক সময়ই দেখা যায়।

—বাপী, তোমরা আসল কথাটাই ভুলে গেছ। নাটকের কথা বলো ! শেলী আবদারের সুরে বলে।

—দুঃখিত শেলী। মিঃ বোহরা, তাহলে আপনি একটা ইংরাজী নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করুন। খরচপত্রের জন্য চিন্তা করবেন না। একটা ব্রোশার পাবলিশ করুন, হাজার পাঁচেক টাকা তুলে দেবার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যত শীগ্‌গির সম্ভব আমি ব্যবস্থা করছি।

—তোমরা কথা বলো। বাপী, আমি একটু ব্যাডমিণ্টন খেলতে যাচ্ছি।

—যাও মা। মিঃ ট্যাণ্ডন অনুমতি দিতেই শেলী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। যাবার আগে সীমাকে উদ্দেশ্য করে বলে—কাম অন আন্টি।

—ঠিক আছে মিসেস বোহরা, আপনি যান। আমরা একটু কথা বলি। সীমা বেরিয়ে যায়।

—আপনি কি মদ্যপান করেন মিঃ ট্যাণ্ডন ?

—নিশ্চয়ই। মিঃ ট্যাণ্ডন হেসে জবাব দেন।

মিঃ বোহরা ওঁকে নিয়ে ভেতরের দিকে একটা দরজা দিয়ে ঢোকেন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা সরু প্যাসেজ। প্যাসেজ পার হয়ে ওরা আর একটা বাড়ির সামনে আসে। আবার সিঁড়ি। ওপরে উঠে একটা টানা বারান্দা পার হয়ে ওঁরা গেস্ট হাউসের দরজায় পৌঁছে যান।

দরজা ঠেলে একটা ঘরে ঢোকেন। ঘরটি সুসজ্জিত। কার্পেটে মোড়া ঘরের মাঝখানে একটা সেণ্টার টেবিল। একপাশে একটা বিরাট আয়না লাগানো আলমারি। অন্যপাশে একটা খাট। গদি আঁটা সুন্দর শয্যা। মিঃ ট্যাণ্ডন ঢুকে একবার ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নেন।

—দেখে মনে হচ্ছে কারও শোবার ঘর মিঃ বোহরা?

—না না, সেরকম কিছু নয়। কখনও এখানে পার্টি হলে অনেক সম্মানিত অতিথি বেশী মদ্যপানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাড়ি যাবার ক্ষমতা পর্যন্ত থাকে না। তাঁদের সম্মান রক্ষার্থেই এইটুকু গোপন ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। তাছাড়া সম্মানিত অতিথিদের প্রকাশ্যে মদ্যপান উচিত নয়। বুঝতেই পারছেন।

—অপূর্ব ব্যবস্থা।

—আসুন তাহলে বসা যাক। মিঃ বোহরা আপ্যায়নের ভঙ্গিতে অনুরোধ করেন।

ইতিমধ্যে একটি সুন্দরী যুবতী ঘরে প্রবেশ করে। মিঃ বোহরা পরিচয় করিয়ে দেন—ইনি মিস দাস, আমাদের সি. সি-এর একজন বিশিষ্ট সভ্যা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীও বলতে পারেন।

মিঃ ট্যাণ্ডনের চোখেমুখে কিঞ্চিৎ অস্বস্তির অভিব্যক্তি।

—আপনি ইতস্ততঃ করবেন না মিঃ ট্যাণ্ডন। মিস দাস আমাদের একজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। মিস দাস আপনিও আমাদের সাথে জয়েন করতে পারেন।

মিস দাস মুখে হাসি ছড়িয়ে সোফায় বসে। ইতিমধ্যে খাবারের প্লেট হাতে মিসেস বোহরা ঘরে ঢোকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেণ্টার টেবিলটি খাবার এবং হুইস্কির বোতলে ভরে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিবেশটি একটা পার্টির আকার নেয়। রেডিওগ্রাম থেকে ইংরাজী গানের সুর ভেসে আসে। পানের মাত্রাও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। একটু পরেই আরম্ভ হয় নাচ। মিঃ এবং মিসেস বোহরা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। মিঃ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে নাচতে থাকে মিস দাস।

ওদিকে শেলীর ব্যাডমিণ্টন খেলা হয়ে গেছে। ক্লান্ত শরীরে ড্রয়িং-রুমে ঢুকে দেখে তার বাপী, আঙ্কল, আন্টি কেউ নেই। তার বদলে

সেখানে বসে আছে এক অপরিচিত সুদর্শন যুবক। একমনে একটা বিদেশী পত্রিকার পৃষ্ঠা ওলটাচ্ছে। শেলী মিঃ বোহরার বেডরুমে ঢোকে। কিন্তু সেখানেও কেউ নেই। অগত্যা ফিরে আসতে হয়। যুবকটি চোখ তুলে চায়। শেলীর সাথে চোখাচোখি হয়। যুবকটি একটু মুচকি হেসে শেলীকে আসন গ্রহণ করতে বলে। খানিকটা সৌজন্যের খাতিরে শেলীকে বলতে হয়—আমি শেলী ট্যাণ্ডন। সি. সি.-এর মেম্বার।

—আমি তপন দাশগুপ্ত। মিথ্যে নাম বলতে গিয়েও তপনের মুখ দিয়ে সত্যি নামটাই বেরিয়ে পড়ে।

—এঁদের কারও সাথে আপনার দেখা হয়েছে? শেলী প্রশ্ন করে।

—না। আমিও ওদের জন্যই অপেক্ষা করছি।

—আপনি কি সি. সি. এর মেম্বার?

—নিশ্চয়ই।

—আপনি কখনও ইংরাজী নাটক করেছেন?

—না। উত্তর দেয় তপন। সেই সাথে শেলীর ছেলেমানুষী কথার ধরনে হেসে ফেলে।

—আসুন না, আপনিও আমাদের সাথে অভিনয় করবেন!

শেলীর সহজ সরল আবেদনের কাছে তপন যেন এক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায়। আস্তে আস্তে বলে—ঠিক এই মুহূর্তে আমি আপনাকে কথা দিতে পারছি না। তবে আপনার কথা আমার মনে রইলো। বিশেষ কোন কাজে জড়িয়ে না পড়লে নিশ্চয় আপনার অনুরোধ রাখবার চেষ্টা করবো।

তপনের উজ্জ্বল চোখের চাহনি এবং সপ্রতিভ কথায় শেলীর মনও আকৃষ্ট হয়। সহজাত ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

—করুন।

—আপনি কোথায় চাকরি করেন?

একটু বিপদে পড়ে যায় তপন। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—আমি ছোটখাটো ব্যবসা করি। সারাদিনের পর বিভিন্ন কাস্টমারের সাথে আমাকে দেখা করতে হয়। কিছু অর্ডার পাওয়া যায় এবং ঘনিষ্ঠতাও বাড়ে।

—হ্যালো শেলী, তোমার ব্যাডমিণ্টন খেলা হয়ে গেল ?

মিঃ বোহরার প্রশ্নে দুজনেই দরজার দিকে তাকায়।

মিঃ বোহরা হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকেন।

—ইয়েস আঙ্কল। বাপী কোথায় ?

—তোমার বাপী একটু ব্যস্ত আছেন। তুমি কি বাড়ি যেতে চাও ?

—বাপীর যদি দেরি থাকে তবে আমি চলে যাবো।

—হ্যাঁ, বোধহয় একটু দেরিই হবে। তাতে কি হয়েছে ? আমি তোমাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবো।

—আন্টি কোথায় ? শেলী প্রশ্ন করে।

—আমি এখানে শেলী। বলতে বলতে মিসেস বোহরা ঘরে ঢোকে।

—সীমা, তুমি আমার গাড়িটা নিয়ে শেলীকে একটু পৌঁছে দিয়ে এসো না ? মিঃ বোহরা অনুরোধ করেন।

—নিশ্চয়ই। চলো শেলী।

—একটু পরে যাচ্ছি আন্টি। আমি মিঃ দাশগুপ্তের সাথে একটু গল্প করছি।

—ইয়ে শেলী, ওর সাথে আমার একটু কথা ছিল। মানে তুমি যদি……মিঃ বোহরাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে শেলী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—ঠিক আছে। আপনি কালকে সন্ধ্যেবেলা আসবেন মিঃ দাশগুপ্ত ?

—হার্ট অ্যাণ্ড সোল চেষ্টা করবো। তবে কথা দিতে পারছি না।

—প্লিজ চেষ্টা করবেন কিন্তু। চাল। চলি আঙ্কল। চলো আন্টি।

ওরা বেরিয়ে যায়। মিঃ বোহরা একটা চুরুট ধরিয়ে আস্তে আস্তে বলেন—কাল তোমার কোন অসুবিধা না থাকলে একবার আসতে পারলে ভাল হয়। মিঃ ট্যাণ্ডন একজন রাঘব বোয়াল। তার মেয়েকে হাতে রাখতে পারলে আমাদের সুবিধাই হবে। যদি সম্ভব হয় ওকেও আমাদের মধ্যে নিয়ে নেবো।

—মিঃ বোহরা, আপনি কিন্তু আমার রেস্ট গ্রাণ্ট করেছেন। আমি একটু বাড়ি যেতে চাই।

—আমি জানি। আমি তোমাকে শুধু অনুরোধ করেছি। অন্ততঃ কালকের দিনটা তুমি……

—ঠিক আছে। আমি কাল আসবো। এবার বলুন আজ আসতে বলেছিলেন কেন ?

—একটা নতুন কাজ হাতে পেয়েছি। তোমার সাথে একটু আলোচনা করতে চাই। মিঃ ট্যাণ্ডন গেস্ট হাউসে আছেন। কুহেলি আছে ওর সাথে। চলো ভেতরে গিয়ে কথা বলি। ওরা দুজনে মিঃ বোহরার শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

॥ চার ॥

কিংসওয়ে করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘর। মিঃ বোহরা বসে আছেন। টেবিলের ওপর রাখা লিংকিং টিউবের আলো জ্বলে ওঠে।—বোহরা। ওপাশে কে ?

—আমি শান্ত কথা বলছি স্যার।

—হ্যাল্লো শান্ত। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। একটু অপেক্ষা করো, আমি আসছি।

কিংসওয়ে করপোরেশনের গুপ্ত ঘরে অপেক্ষা করছে শান্ত। কোম্পানির চাকুরে হিসেবে যে পরিচয় বহন করবে, তার যাতায়াত হবে এই গুপ্তঘরের মাধ্যমে। শুধু একটা পরিচয়। এই কথাটাই ভাবছিল শান্ত।

এখন সে শান্ত মৈত্র। বীথিকে বিয়ে করে আনা তার প্রথম কাজ। এর ওপর নির্ভর করছে তার উন্নতি। হ্যাঁ, তাকে বাঁচতে হবে। দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে করে শেষে তাকে হার মানতে হয়েছে। সহায়সম্বলহীন একজন অসহায় যুবক। পৃথিবীতে কানাকড়িও তার দাম নেই। অথচ আজ সুন্দর পোশাক পরে সে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে, পথচলতি অনেক সুন্দরী মেয়ের বুকে গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। চকচক করে ওঠে অনেক মেয়ের বাবার চোখ। আর সে সব কিছু

উপেক্ষা করে এগিয়ে চলে। এক চরম আত্মশ্লাঘা, এক অনাস্বাদিত গর্ব ওকে ছেয়ে ফেলে।

অথচ মাত্র কয়েকমাস আগের কথা। ইনকামট্যাক্স অফিসে একটা ইন্টারভিউ পাওয়ার পর শুধু পয়সার অভাবে···পিউ শুনে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। বার বার বলেছিল—তুমি আমায় কেন একবার বললে না?

স্তব্ধ হয়ে শান্ত শুধু জবাব দিয়েছিল—চাকরিটা আমার হতো না পিউ। ওখানে ব্যাকিং না থাকলে চাকরি হয় না। আমার তো কোন ব্যাকিং নেই।

পিউর মুখখানা ভেসে ওঠে। ও খুব ভাল রবীন্দ্র সংগীত গাইতে পারে। শান্তর মনে হয় সে অনেকদিন পিউর গান শোনেনি। বেচারি গানের টিউশানির টাকা থেকেই শান্তকে টাকা দিতে চেয়েছিল। এবার থেকে শান্ত ওকে টাকা পাঠাবে। গান শেখানো ছেড়ে দিয়ে ও নিজে আরও ভাল করে গান শিখুক।

—স্যরি শান্ত, আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। মিঃ বোহরা গুপ্তঘরে ঢোকেন।

—ঠিক আছে। আমার কাজ কেমন হলো বলুন?

—ভেরী গুড্। প্রথম কাজ হিসেবে সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে একটা কথা যেটা তোমাকে আগেও বলেছি, আবার বলছি, কোন দুর্বলতাকে মনে স্থান দেবে না। এতে শুধু তোমার একার বিপদ নয়, অনিমেষবাবু হাসি দেবী সবাই এর সাথে জড়িত।

—জানি স্যার। সজ্ঞানে অন্ততঃ কোন দুবলতা প্রকাশ করবো না।

—অজ্ঞানেও নয়। বীথিকে নিয়ে মাদ্রাজের একটা দলের সাথে কথাবার্তা হচ্ছে। ভাবছি ওকে ওখানেই ঠেলে দেবো। তবে মেয়েটি বুদ্ধিমতী। সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে। যাই হোক তুমি আপাততঃ কিছুদিন কলকাতায় থাকো। তারপর হয়ত একবার বম্বে যেতে হবে। ওখানকার কাজটাও খুব ইন্টারেস্টিং। আমাদের বম্বের প্রতিনিধি মিঃ পানিকর জানিয়েছেন বম্বের কোন লোকের পক্ষে কাজটা করার অসুবিধা আছে।

—আমি প্রস্তুত।

—ঠিক আছে। ভাল কথা, তপন কিছুদিনের জন্য বাড়ি যেতে

চাইছে। তুমি ওর ফ্ল্যাটে কিছুদিন থাকবে। সন্ধ্যে নাগাদ ক্লাবে আসবে। রাতটা ইচ্ছে করলে গেস্ট হাউসেও কাটাতে পার। অবশ্য বীথির সাথে তোমাকে রাখতে চাই না।

—আমিও থাকতে চাই না স্যার।

—আবার সেই দুর্বলতা। যাকগে, এখন তুমি কোথায় যাবে ঠিক করেছো?

—কিছুই ঠিক করিনি।

—তাহলে আপাততঃ তুমি গেস্ট হাউসে গিয়ে বিশ্রাম করো। সন্ধ্যেবেলা তোমার বউদিকে নিয়ে একটা সিনেমা দেখে এসো। পরচুলোটা পরতে ভুলো না যেন।

শান্ত গুপ্তঘর থেকে বেরিয়ে সোজা গেস্ট হাউসের দিকে যায়। সেখানে মিস দাস ওরফে কুহেলি রয়েছে। ওর বাড়ি ছিল হুগলী জেলার একটা গ্রামে। মামা বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে ছিল। তপন সেখানে গিয়েছিল ফ্যাক্টরী সাইট দেখতে। ওখানেই আলাপ হয় তপনের সাথে। মামা-মামী প্রথম থেকেই একটু প্রশ্রয় দিয়েছিল। একটু হৃদ্যতা হতেই তপন একদিন কোলকাতায় বেড়ানোর প্রস্তাব দিতেই মামা-মামী যেন হাতে চাঁদ পেলো। বিনে পয়সায় যদি কাঁধের বোঝাটা নেমে যায়, সেই লোভেই ওরা তপনের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল।

সারাদিন কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে সন্ধ্যের পর আত্মীয় বাড়ির নাম করে তপন ওকে এখানে এনে তুলেছিল। তারপর থেকে কুহেলি মিস দাস হয়ে এখানেই রয়ে গেছে। মিঃ বোহরার কথায় কাঁদতে কাঁদতে কুহেলি বলেছিল—মামাবাড়ি ফিরে যাবার পরিবর্তে সে যে কোনও কাজ করতে রাজী। কাজটা বুঝিয়ে দেবার পর কুহেলি একটু আপত্তি করেছিল। মিঃ বোহরা তাকে বাস্তব জীবনের অসহায়তা এবং অন্যদিকে শুধু সতীত্ব নামক সস্তা সেন্টিমেণ্ট ত্যাগ করার বদলে এক সচ্ছল জীবনের ছবি দেখাতে কুহেলি রাজী হয়ে গেল। ইংরাজী নাচ এবং আদব কায়দা শিখে নিতে তাকে খুব বেগ পেতে হয়নি। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে আজ রূপোপজীবিনী। নিঃশব্দে পুরুষদের সামনে নিজেকে তুলে ধরা যায় কাজ—তার বদলে পেট-

ভরা ভাল ভাল খাবার, সুন্দর সাজ-পোশাক। মনে মনে ভেবেছে কি হবে সতীত্ব দিয়ে? তার চেয়ে এই ভাল। ইদানীং একটু আধটু সুরাপান করে কুহেলি। বোধহয় অতীত আর বর্তমানের মাঝখানে অদৃশ্য ফাঁকটা ঢাকবার জন্য।

লিংকিং টিউবের মাধ্যমে কুহেলি মিঃ বোহরার নির্দেশ পায় একটি যুবককে তিনি পাঠাচ্ছেন। কুহেলি যেন তাকে যথাসাধ্য এণ্টারটেন করে। কুহেলি প্রস্তুত। টুং টাং আওয়াজে কলিং বেলটা বাজতেই কুহেলি হাসি মুখে শান্তকে অভ্যর্থনা জানায়। শান্ত ধীর পায়ে ঘরে ঢোকে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায় কুহেলির দিকে।

কুহেলি জিজ্ঞাসা করে—কি খাবেন বলুন?

—আপাততঃ কিছু জলখাবার। তারপর দুপুরে যা হোক কিছু।

—স্নান করবেন তো?

—হ্যাঁ।

—আমি আপনার জলখাবারের ব্যবস্থা করে আসছি। আর বাথরুমে স্নানের সব কিছুই আছে।

—আপনাকে কি বলে ডাকবো?

দাঁড়িয়ে পড়ে কুহেলি। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে। তারপরেই বলে ওঠে—আপনার যা খুশী তাই বলেই ডাকতে পারেন। আসলে আমাদের কোন নাম নেই। যে যার পছন্দমতো নামে ডাকে। আমি সব নামেই উত্তর দিই। এবার বলুন আপনি কি নামে ডাকবেন?

—আপনার বাড়ির নামটাই বলুন না। অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। মেঝের দিকে চেয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে কুহেলি। ধীরে ধীরে বলে—কুহেলি।

—বাঃ, ভারী সুন্দর নাম তো? আপনাকে আমি কুহেলি বলেই ডাকবো।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে কুহেলি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। শান্ত রেডিওগ্রাম খুলে দেয়। সেখানে ইংরাজী গানের রেকর্ড বাজতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে কুহেলি ফিরে আসে। মন্থর গতিতে শান্তর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে—আপনার যা যা দরকার বলবেন কিন্তু!

—আপাততঃ চাইছি আপনি আমার কাছে থাকুন।

একটা শিহরন খেলে যায় কুহেলির বুকে। বিমানও ওই কথাই বলেছিল। তোমাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে কুহু সব সময়। এমন কি যখন কাজ করি, তখনও যদি তুমি আমার পাশে থাকতে ··কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয়।

এক নিবিড় আবেশে কুহেলি বিমানের বুকে মাথা রেখে বলেছিল —তুমি আমাকে মামা-মামীর হাত থেকে বাঁচাও বিমান। আমি সারাজীবন তোমার বাঁদী হয়ে থাকবো।

তারপর···একদিন কলকাতায় বেড়াবার নাম করে বিমান এখানে এনে তুললো। বিমান হারিয়ে গেল কুহেলির জীবন থেকে। হয়ত আর কোনদিন দেখা হবে না।

কুহেলি নিজের মনেই বলে—বিমান সিঁথিতে সিঁদুরের টিপ পরে তোমার বুকে মাথা রেখে হয়ত জীবন কাটাতে পারলাম না। তবু তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি আমাকে আরেকটা জীবনে প্রবেশ করিয়েছো। দেহদানের বিনিময়ে অজস্র অভিজ্ঞতা, নিশ্চিন্ত দু' মুঠো ভাত, রমণীয় পোশাক-পরিচ্ছদ এবং উঁচু মানের জীবন ধারণ। আমার মতো অশিক্ষিতা এক গ্রাম্য মেয়ের এর চাইতে ভাল জীবন আর কি হতে পারতো? এক ভোগ্যার বদলে আমি এখন বহুভোগ্যা। নিজেকে বেশ্যা ভাবতেই যা একটু খারাপ লাগে। আর কিছু নয়।

—কি ভাবছেন? অবশ্য আমি আপনাকে জোর করবো না। আপনার ভাল না লাগলে···

—সে কি, আমার ভাল না লাগার তো কারণ নেই? আপনাকে সঙ্গ দেওয়াই তো আমার কাজ।

শান্ত কুহেলির দিকে চোখ তুলে চায়। আস্তে করে ডাকে—কুহেলি।

কুহেলি আলতো করে তাকায়।

—আপনাকে আপনি আপনি করতে ভাল লাগছে না।

—বেশ তো তুমিই বলবেন। কুহেলি মৃদু হেসে সমর্থন জানায়।

—কাছে এসো।

শান্তর আহ্বানে কুহেলি কাছে আসে কিন্তু পাশে বসে না।

—আপনি এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি আপনার খাবারটা নিয়ে আসি।

কুহেলি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর শান্ত ভাবতে থাকে, এই জীবনটাই বা মন্দ কি! নিশ্চিন্ত আরাম। অন্ন-বস্ত্র-অর্থ কিছুরই অভাব নেই। উপরি হিসেবে-পাওয়া যায় নারী-সঙ্গ এবং মদ্যপান। নারী-সঙ্গও তার জীবনে ওই প্রথম। আবার বীথির মুখখানা ভেসে ওঠে। চোখ পড়ে আংটিটার ওপর। অনামিকায় এখনও জ্বলজ্বল করছে। মনে পড়ে হাওড়া স্টেশনে ভিড়ে হারিয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে বীথির চোখে যেন সন্দেহের ছায়া দুলছিল। শান্তর দুর্বলতা কি মুখে ফুটে উঠেছিল? অবশ্য চিন্তার কোন কারণ ছিল না, কেন না ওদের রিসিভ করতে গিয়েছিল তপন। মিঃ বোহরার কথা অনুযায়ী তপন খুবই নির্ভরযোগ্য।

এক অদম্য কৌতূহল জাগে শান্তর মনে। বীথি এখন কি করছে? হয়ত খুব কান্নাকাটি করছে। নয়ত প্রতারণার ধাক্কায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। এই কুহেলিও নিশ্চয়ই তেমনি এক প্রতারিতা মেয়ে।

কুহেলি ঘরে ঢোকে। সোজা শান্তর পাশে এসে বসে। খাবারের প্লেট নামিয়ে রাখে সামনের টেবিলে। শান্ত তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে। কুহেলি শূন্য প্লেট নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আবার তক্ষুনি ফিরে আসে।

—দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলে না?

—এখানে কেউ আসবে না।

—তবু দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমার অস্বস্তি লাগছে।

ক্ষীণ এক টুকরো হাসি খেলে যায় কুহেলির ঠোঁটের ফাঁকে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পাশে এসে বসে। শান্ত কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে কুহেলির চোখের দিকে। কি যেন খোঁজে। কিন্তু কুহেলির ভাবলেশহীন অভিব্যক্তি নিস্পৃহ। কোন বেদনার ছাপ নেই। শান্ত ওকে কাছে টেনে নেয়। বাঁ হাতে গলা জড়িয়ে ধরে। ছোট্ট একটা চুমু এঁকে দেয় ওর ঠোঁটে। কুহেলি চোখ বোজে। শান্ত আলতো করে ডাকে—কুহেলি।

ও চোখ মেলে চায়।

—এ জীবন তোমার কেমন লাগছে ?

নিঃশব্দে ভ্রূ কুঁচকে যায় কুহেলির। শান্ত স্বরে জবাব দেয়—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বারণ আছে। আমাকে মাফ করবেন।

—তবু আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করছি। কথা দিচ্ছি পৃথিবীর কেউ কোনদিন এ কথা জানতে পারবে না।

—ভাল। উত্তর দেয় কুহেলি।

—এতটুকু উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। প্লিজ আরও একটু বলো।

—আপনার নাম জানি না, কোনদিন দেখিনি, আপনাকে চিনিও না। তবু বলছি, আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না আমাকে। যে ভাবে আছি আমাকে সেই ভাবেই থাকতে দিন।

—আমার নাম শান্ত মৈত্র। তুমি শুধু আমাকে বিশ্বাস করো কুহেলি।

—বিশ্বাসের কথা বলবেন না। শুনতে খারাপ লাগে। আপনার অনুসন্ধিৎসার উত্তরে বলছি, আমি ভাল আছি। অতীত আমার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন। শিশুকাল আর কৈশোরটুকু বাদ দিলে আমার জীবনে মনে রাখার মতো কোন অতীত নেই।

—আমার কিন্তু আছে। অনেক দুঃখের, সুখের, হাসি-কান্নায় মেশানো এক বেদনামধুর অতীত। মাঝে মাঝে ওরা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমায় হাসায় কাঁদায় কখনো ভোলায়। কুহেলি, তুমি জানতে চাও সে সব কথা ? আমি তোমাকে সব বলতে পারি। কেন জান ?

—কেন ?

—কেন না আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। তোমাকে দেখেই আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে।

—আমি আপনার অতীত জানতে চাই না। বিশ্বাসও আপনাকে করি না। এখানে যাঁরা আসেন তাঁদের দেখাশোনা করা আমার কাজ। তার বদলে খাওয়া-পরা এবং পারিশ্রমিক পাই। কি হবে অন্যের কথা জেনে বলুন ?

—কিন্তু জীবন থেকে তুমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছো কেন ?

—জীবন দিয়েই বুঝেছি, কাউকে বিশ্বাস করতে নেই—তাই।

—তাহলে যে বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তুমি আজকের জীবনে দাঁড়িয়ে আছো, তাও তো একদিন ভেঙ্গে যেতে পারে।

—পারে। তবে এটুকু বুঝেছি আমার যৌবন যতদিন আছে ততদিন দু'মুঠো ভাতের অভাব আমার হবে না; হয়তো আস্তানা বদল হবে। আমার কাছে সবই সমান।

—তবু তোমার ইচ্ছে করে না এক টুকরো গৃহকোণ, স্বামী, সন্তান। দুটো ছোট ছোট হাত তোমার গলা জড়িয়ে ধরছে……

—চুপ করুন শান্তবাবু। চিৎকার করে ওঠে কুহেলি। তারপরেই হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে—প্লিজ, ওই কথাগুলো বলবেন না। ওই এক টুকরো লোভেই আমি আজ এখানে এসে পৌঁছেছি। শান্তবাবু, আমাদের মতো সহায়সম্বলহীনা মেয়েদের দেহটাকে নিয়ে আপনারা খেলছেন খেলুন, কিন্তু ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না। বার বার একটা দুর্বল জায়গায় আঘাত করবেন না। আমাদের সহনশীলতারও তো একটা সীমা আছে। আপনি যেভাবে খুশী আমাকে ভোগ করুন। দয়া করে ওসব কথা বলবেন না। কুহেলি দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

শান্ত স্তব্ধ। একটা বারাঙ্গনা মেয়ের জীবনে এত ব্যথা? বীথিও কি এমনিভাবে অন্য কোন পুরুষের সামনে বসে কাঁদছে? আবার সেই মুখ। শান্তর হাতে মাথা রেখে বলছে—এটুকুই তো চেয়েছিলাম। তোমার মতো দরদী স্বামী আর···চুপ করে যায় বীথি। শান্ত ওর মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে বলে—আর কি?

—বলবো না যাও। বীথি লজ্জা পায়। শান্ত আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে—আমি বলছি, ছোট্ট একটা শিশু। টলটলে পায়ে সারা ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। হাসছে, তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। শুনতে শুনতে বীথি প্রাণপণে শান্তকে আঁকড়ে ধরেছে।

—ছাড়ো ছাড়ো বীথি, আমার দম আটকে আসছে।

শান্তর বুকের ওপর বীথি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে বলে—হ্যাঁ একটা শিশু। তুমি আমায় দেবে বলো? তোমার কাছে আর কিছু চাই না আমি।

—তার মানে তোমাকে একটি শিশু উপহার দিলেই তুমি আমাকে ভুলে যাবে। ওরকম উপহার কেউ দেয়?

শান্তর ঠাট্টায় বীথি মিষ্টি করে হাসে। চিমটি কেটে বলে—হিংসুটে।

—শান্তবাবু, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি বোধহয় পরিবেশটা নষ্ট করে দিয়েছি।

কুহেলির কথায় শান্ত বাস্তবে ফিরে আসে। দুর্বল হয়ে পড়েছিল বলে নিজের ওপর রাগ হয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে শান্ত বলে—না কুহেলি, আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। তোমাকে অন্যায় অনুরোধ করার জন্য তুমিও আমাকে ক্ষমা করো।

নিজেকে দারুণ ক্লান্ত মনে হয় শান্তর। উঠে গিয়ে খাটের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে।

॥ পাঁচ ॥

কসমোপলিটান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের গেস্ট হাউস নং—২ বীথি বসে আছে একটা ঘরে। ছায়া-ছবির দৃশ্য পরিবর্তনের মতো সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। ভোর হয়ে আসছে। দূরে কোথাও একটা গাড়ির হর্নের আওয়াজ হলো। বিছানার চারিপাশে তাকায়। অগোছালো কোঁচকানো বিছানা। কাল অনেক রাত পর্যন্ত তার সাথে একই খাটে শুয়েছিল এক অপরিচিত পুরুষ। অথচ শুভ্রাংশু? পবিত্র দেবতার মতো লোকটা প্রতারক? সবটাই কি প্রতারণা? না শুভ্রকে ফাঁকি দিয়ে ওই লোকটাই···তা কি করে হয়, ওদের আনতে হাওড়া স্টেশনে তো ওই লোকটাই গিয়েছিল। "তুমি ওর সাথে যাও, আমি মালপত্র নিয়ে আসছি। যাও বীথি, তোমার কোন ভয় নেই।" তারপরেই শুভ্র কোথায় যেন হারিয়ে গেল। এক অদ্ভুত নাটক। শুভ্র কি তবে এতদিন এই পরিণতির জন্য মহড়া দিয়েছিল? তবে কি রাতের পর রাত পরপুরুষকে সঙ্গী করেই আমাকে

জীবন কাটাতে হবে? এই অপরিচিত শহরে যেখানে যাবো, সেখানেই তো ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে পুরুষেরা…শুভ্রাংশু…জল ভরে আসে বীথির চোখে। ভাবতে থাকে আমি কোথায়?

খুট করে দরজায় আওয়াজ হয়। দরজা ঠেলে ঢোকে কুহেলি। ওর হাতে জলখাবার।

—আপনার হাতমুখ ধোওয়া হয়েছে?

বীথি কোন জবাব দেয় না। ওর দিকে চেয়ে থাকে।

কুহেলি ওর কাছে আসে। কাঁধে হাত রেখে বলে—ভেবে আর কি হবে? ভাগ্যটা মেনে নিন। যান মুখ হাত ধুয়ে আসুন।

সম্মোহিতের মতো বীথি উঠে বাথরুমে ঢোকে। কাল রাতেও সে একবার এই বাথরুমে ঢুকেছিল। দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। নাঃ, বেরোবার কোন পথ নেই। দিনের বেলাতেও আলো জ্বালতে হয়। সামনে বিরাট আয়না। নিজেকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে বীথি আয়নার দিকে তাকায়। সারা গায়ে আচড়ানো কামড়ানোর দাগ। কাল রাতের বীভৎস খেলার সাক্ষী। অপরিচিত লোকটাকে হঠাৎ ঘরে ঢুকতে দেখে বীথি চিৎকার করে উঠেছিল! লোকটি শুধু বলেছিল, কোন লাভ নেই। তোমার চিৎকার কেউ শুনতে পাবে না। তুমি নতুন তাই আগে থেকেই বলে রাখি, এখানে নেগেটিভ কোন আচরণ আমরা সহ্য করি না। আজ রাতে আমি তোমার ঘরে থাকবো। আশা করি বিবাহিতা মেয়েকে রাত্রে থাকার মানেটা বুঝিয়ে বলতে হবে না।

বীথি স্তব্ধ হয়ে লোকটাকে দেখছিল। সমস্ত গা যেন হিম হয়ে আসছে। একটা নারকীয় পরিবেশ। লোকটা আস্তে আস্তে বীথির দিকে এগিয়ে এলো। মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। বীথির গালে হাত দিলো। হঠাৎ প্রাণপণে চেপে ধরে পাগলের মতো চুম্বন করতে লাগলো। অসীম শক্তি ওর গায়ে। সুতরাং আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় নেই। লোকটা অজগর সাপের মতো বীথিকে জড়িয়ে ধরেছে। ওর জিভটা খেলা করছে বীথির মুখের ভেতর। একসময় ছেড়ে দিয়ে বলে—বাঃ, তুমি মাল ভাল। এর আগেরটা তোমার মতো এতো নরম ছিল না।

লোকটা বেরিয়ে যায়। বাইরে থেকে তালা লাগাবার শব্দ আসে। মুখটা তেতো লাগছে। সারা মুখে মদের গন্ধ। বীথি ভাবে, কি অদ্ভুত

এই খেলা। স্বামীর সাথে যেটা সহবাস, সুখের জিনিস, যার জন্য সারাদিন বীথি উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতো, সেটাই পাত্র পরিবর্তনের জন্য হলো বলাৎকার। তবু লোকটা আবার আসবে।

এলো স্লিপিং গাউন পরে অনেক গভীর রাত্রে। ক্লান্ত বীথি খানিকটা ঘুমিয়েও নিয়েছিল। পর পর তিনবার বীথির দেহটাকে নিয়ে এক দানবীয় উল্লাসে মাতার পর বীথিকে রেহাই দিয়েছিল। তবু ওর জংলী স্বভাবের মধ্যে কোথায় যেন পৌরুষ লুকানো ছিল। অত্যাচারের মধ্যেও বীথির মনে কোথায় একটা ভালো লাগা মিশে ছিল। কিছুক্ষণের জন্য হলেও ধর্ষণ সামাজিক সহবাসকে হারিয়ে দিলো। বীথি মনে মনে ভাবে, শুভ্র, তবু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমার কাছে আত্মসমর্পণে আমার হৃদয়ের সাড়া ছিল। এই লোকটার বেলায় তা ছিল না।

নিজের অজান্তেই আঁচড়ানো কামড়ানো জায়গাগুলোর ওপর বীথি পরম যত্নে হাত বোলাতে থাকে। ধর্ষণের দাগ ভালোবাসার দাগের চাইতেও গভীর। অনিচ্ছুক অনুভব ইচ্ছাকৃত উপলব্ধির চেয়ে তীব্র। হঠাৎ সিঁথির দিকে চাইতেই চমকে ওঠে বীথি। আয়নার সামনে নগ্ন বীথির সিঁথিতে সিঁদুরের দাগটা অস্পষ্ট। ওখানেই লুকিয়ে আছে শুভ্রাংশু। হাত দিয়ে আলুথালু চুলগুলো সরিয়ে সিঁথিটাকে স্পষ্ট করে তোলে। বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে ওঠে। শুভ্রাংশু, তোমার দেহে তো আমার কোন চিহ্ন নেই। আমি জানি তুমি আমায় ভুলে যাবে। কেঁদে ওঠে বীথি। ওর নগ্ন দেহটা কাঁপতে থাকে।

শাওয়ারের নবটা শেষ পর্যন্ত ঘুরিয়ে দেয়। বৃষ্টির মতো জল পড়ছে। চোখ বুজে জলধারার নীচে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ। একটু একটু শীত করে। বাথরুমের দরজায় ধাক্কা পড়ে। বীথি লজ্জা পায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দ্যাম্ দ্যাম্ দ্যাম্ দ্যাম্। মেয়েটির সংশয়জড়িত স্বর—শুনছেন, আপনি বেরিয়ে আসুন। অত চান করবেন না, ঠাণ্ডা লেগে যাবে। প্লিজ বেরিয়ে আসুন।

মেয়েটির ভয়মিশ্রিত স্বরে বীথির মনে একটু সাড়া লাগে। শাওয়ার বন্ধ করে ও গা মুছতে থাকে। আবার সেই দাগগুলো চোখে পড়ে। উন্মত্ত সম্ভোগের চিহ্ন! চোখ পড়ে সিঁথির দিকে। অস্পষ্ট সিঁদুরের দাগটা এখন সম্পূর্ণ অন্তর্হিত।

—শুনছেন, আপনি বেরিয়ে আসুন। ওপাশ থেকে আবার মেয়েটির গলা শোনা যায়। বীথির মনে হয় মেয়েটি যেন তাকে এক জীবন থেকে অন্য জীবনে ঢুকতে অনুরোধ করছে।

বীথি বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। ওর সামনে একরাশ খাবার। বীথি চুল আঁচড়াতে থাকে। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে সামনে। বীথি ওর দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করে—আপনি কি কিছু বলবেন ?

—বলছি যেখানে নিজের ইচ্ছা অন্যের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল সেখানে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ না করাই বোধহয় ভালো।

বীথি কোন জবাব দেয় না। চুল আঁচড়াতে থাকে। মেয়েটি আবার বলে—আপনি আপনার স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানকার নিয়মকানুনের সাথে খাপ খাইয়ে নিন। নইলে নিজেই কষ্ট পাবেন।

বীথির চুল আঁচড়ানো থেমে যায়। মনে হয় এই মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলে বোধহয় এখানকার ব্যাপার কিছু কিছু জানা যাবে। একটা প্রশ্নই বীথিকে বার বার খোঁচাচ্ছে। শুভ্র ইচ্ছা করেই বীথিকে এখানে আনিয়েছে না এটা নিতান্তই একটা দুর্ঘটনা। আস্তে আস্তে মেয়েটির দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করে—আমার একটা কথার জবাব দেবেন ?

—বলুন। সম্ভব হলে দেবো। মেয়েটি শান্ত গলায় জবাব দেয়।

—আমাকে এখানে আনা হয়েছে কি আমার স্বামীর মতে না অমতে ?

মেয়েটি যেন একটু চমকে ওঠে। তারপর মাথা নীচু করে বলে—কি হবে জেনে ?

—আমার স্বামী সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণায় আসতে চাই। আপনি মেয়ে আমিও তাই। দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করুন। অন্ততঃ আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি সেটুকু আমায় বুঝতে দিন।

—আপনার স্বামীকে আপনি ভুলে যান। যদি পারেন পুরো অতীতটাই ভুলে যাবার চেষ্টা করুন। বর্তমানকে মেনে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকুন। আর ··

—আর কি, থামলেন কেন বলুন ? বীথির চোখে মুখে কাতর অভিব্যক্তি।

—আপনি এখন একটা সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ। এ জগতে

একজন বিধাতা যাঁর নিয়ন্ত্রণে সবকিছু চলছে। এমনকি আপনার ভবিষ্যৎও। তারপর আপনার ভাগ্য।

—আরও একটু পরিষ্কার করে বলুন।

—এর থেকে পরিষ্কার করে বলতে গেলে আপনার ঘটনাগুলো আমার জানা দরকার।

বীথি যেন নিজের মধ্যে হারিয়ে যায়। ওর সামনে বসে আছে মেয়েটি। দুজনের মাঝখানে সেণ্টার টেবিলের ওপর একরাশ খাবার। মেয়েটি উদ্‌গ্রীব হয়ে একসময় বলে—আপনি খান। খেতে খেতে কথা বলুন।

—আপনার নাম কি ভাই?

—কুহেলি। আপনার?

—বীথি। এসো আজ থেকে আমরা বন্ধু হই।

কেঁপে ওঠে কুহেলি। ভয়চকিত স্বরে বলে—না ভাই, বন্ধুত্ব করতে পারবো না।

—কেন?

—রাখতে পারবো না বলে। আমায় তুমি ক্ষমা করো ভাই। বলো, এখানে আসার আগে তোমার ঘটনাগুলো বলো।

বীথি দূরমনস্ক হয়ে পড়ে। ফেলে আসা অতীত যেন ছবির মতো ওর মানসপটে ভেসে ওঠে। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর ও আস্তে আস্তে বলতে শুরু করে…

বর্ধমানের এক ছোট গ্রামে আমাদের বাড়ি। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি। বাবা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে কয়েক বছর হলো। ছোট ভাইটি হঠাৎ মারা যায়। রাজনীতির শিকার। ও মারা যাবার পর বাবা কেমন যেন জবুথবু হয়ে যায়। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে বাবার দিকে তাকাতেই পড়াশুনা ছেড়ে দিলাম। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাবা বলতেন, "তোকে পাত্রস্থ করতে পারলে নিশ্চিন্ত হতাম মা।"

বিয়ে সম্বন্ধে আমার একটা ভীতি ছিল। বান্ধবীদের বিয়ে দেখে বুঝেছিলাম, অনেক টাকা পণ না দিতে পারলে ভাল পাত্র পাওয়া যায় না। অথচ আমার বিয়ে দিলে বাবার আর কোন সম্বলই থাকবে না। গড়িয়ে গড়িয়ে দিনগুলো কাটছিল। হঠাৎ একদিন এক ভদ্রলোক এলেন

বাবার সাথে। আড়াল থেকে ওদের কথাবার্তা শুনে বুঝলাম আমার বিয়ের ব্যাপারেই ভদ্রলোক এসেছেন।

পাত্র কলকাতায় চাকরি করে। পাত্রী পছন্দ হলে এক পয়সাও পণ নেবে না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম এখানেই যেন আমার বিয়ে হয়। তারপর এক গোধূলি বেলায় পাত্র নিজে আমাকে দেখতে এলো। আমাকে দেখে ওর পছন্দ হলো। বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে। নাম শুভ্রাংশু সেন।

বিয়ের কথাবার্তা যখন প্রায় পাকাপাকি একদিন সকালবেলা বাবা বাজারে গেছেন, এমন সময় শুভ্রাংশু এসে হাজির। আমি অবাক্। ও হেসে বললো—একটু এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম একটু দেখা করে যাই।

আমার কিন্তু ওর সহজ সরল কথা শুনে দারুণ ভালো লেগেছিল। সপ্রতিভ কথাবার্তায় শুভ্রাংশুই আমার লজ্জা কাটিয়ে দিলো।

আমাদের পাড়া থেকে খানিকটা দূরেই ওরা বাসা ভাড়া করে আছে। ইচ্ছে আছে ওখানেই জমি কিনে বাড়ি করে শ্বশুর শাশুড়ী থাকবেন। আমি আর শুভ্র থাকবো কলকাতায়। যথা সময়ে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। কয়েকটা দিন বর্ধমানের শ্বশুর-বাড়িতে থেকে কলকাতায় বাসা ঠিক করে শুভ্র আমাকে এখানে নিয়ে এলো। হাওড়া স্টেশন থেকেই শুভ্র যেন কোথায় হারিয়ে গেল। এবার বলো তো কুহেলি আমি কোথায়? কি আমার ভবিষ্যৎ? এরপর কোথায় যাবো?

নিঃশব্দে কুহেলি এতক্ষণ ওর কথা শুনছিল। বীথির শেষ প্রশ্ন-গুলোয় একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো কুহেলির বুক খালি করে। ও উঠে আসে বীথির সামনে। ওর দু'গালে হাত বুলিয়ে আদরের ভঙ্গিতে বলে—বিয়ের সবটাই সাজানো। শুভ্রাংশুর দেখা আর কোনদিন পাবেন না। এরপর ও আরও বীথিকে বিয়ে করবে। তাদের জীবন থেকেও ঠিক তোমার মতো শুভ্রাংশু হারিয়ে যাবে। সেই বীথিরাও এখানে আসবে। তাদের ঘরেও রাত কাটিয়ে যাবে অপরিচিত মত্তপ পুরুষ। তারপর···তারপর···

—তারপর কি কুহেলি?

—তারপর আর জানি না। কয়েকটা দিন এখানে থাকার পর বীথিরাও কোথায় যেন হারিয়ে যায়। সেটুকুর খোঁজ আমি জানি না।

কথা বলতে বলতে কুহেলি যেন এক অন্য জগতে চলে যায়। শূন্য দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে চেয়ে থাকে।

—আমার জীবনটা এভাবে নষ্ট করে দিয়ে কি লাভ হলো শুভ্রাংশুর। বীথি প্রায় চিৎকার করে ওঠে। কুহেলি কিন্তু একটুও চমকায় না। শুধু বলে—লাভ নিশ্চয়ই কিছু হয়। নইলে বীথিদের জীবন শুভ্রাংশুরা নষ্টই বা করবে কেন? যাকগে, তুমি খেয়ে নাও ভাই।

—আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

—না খেয়ে আর ক'দিন থাকবে? বললাম যে, সব কিছু মেনে নেওয়াই এখানকার নিয়ম।

হঠাৎ দরজাটা খুলে যায়। ওরা দুজনেই চমকে দরজার দিকে তাকায়। ঘরে ঢোকেন মিঃ বোহরা। কুহেলিকে উদ্দেশ্য করে বলেন—তুমি একটু বাইরে যাও কুহেলি। আমি এর সাথে একটু কথা বলবো। কুহেলি বেরিয়ে যায়। মিঃ বোহরা দরজাটা বন্ধ করে দেন।

॥ ছয় ॥

বেহালার ছোট একটা বাড়ি। দুখানা ঘর। সামনে একফালি ছোট জায়গা। চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। হাসি দেবী থাকেন। নিঃসঙ্গ জীবনে তার সাথী লক্ষ্মীর মা। বিকেলের রোদ গা এলিয়ে ছড়িয়ে আছে ভেতরের বারান্দায়। দিবানিদ্রা সেরে হাসি দেবী বারান্দায় এসে বসেন। ঝিরঝির করে হাওয়া বইছে। একটা হাই তুলে হাসি দেবী বলেন—একটু চা করো তো লক্ষ্মীর মা।

লক্ষ্মীর মা দিনে ঘুমোয় না। এটা সেটা করে দুপুরটা কাটিয়ে দেয়। বারান্দায় এক কোণে বসে কাঁথা সেলাই করছিল, হাসি দেবীর কথায় সে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

হাসি দেবী তাকিয়ে আছেন সামনের সজনে গাছটার দিকে। গাছের ডালে একটা মাছরাঙা পাখি এসে বসে। হাসি দেবীর মনে হয় পাখিটা

একা কেন? ওর সাথী নেই? কথাটা মনে পড়তেই নিজের কথা মনে পড়ে। পাখির সমাজে সাথী না হলেও ওদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু মানুষের জীবনে বিশেষ করে মেয়েমানুষের জীবনে একজন সাথী চাই। অথচ…

ব্যথায় টনটন করে ওঠে হাসি দেবীর ভেতরটা। একটা মুখ ভেসে ওঠে। নিষ্পাপ, সরলতামাখা। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে যাকে কোনদিন অন্যায় করা তো দূরের কথা, অন্যায় চিন্তা করতেও দেখেনি। শুধু একটা ব্যথা মাঝে মাঝে দুঃখ দিতো মানুষটাকে। প্রায়ই বলতো— মরার সময় একটা দুঃখ নিয়েই মরবো, তোমাকে কোন সন্তান দিয়ে যেতে পারলাম না। নিঃসন্তান অবস্থায় বুড়ো বয়সে তোমাকে কে দেখবে বলো তো? বলতে বলতে মানুষটার চোখ ভরে আসতো জলে। হাসি দেবী কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন—তাতে কি হয়েছে? পৃথিবীতে সব মেয়েরাই কি আর মা হতে পারে? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার সেবা করে সিঁথির সিঁদুর নিয়ে যেন মরতে পারি।

কোথায় যেন সব হারিয়ে গেল। যশোহর জেলার সেই ছোট্ট গ্রাম। এক কোণে নিরিবিলিতে বাস করতেন সনৎ আচার্য আর তার স্ত্রী হাসি দেবী। শহরে এক মাড়োয়ারী গদিতে কাজ করতেন তিনি। নির্বিরোধ, শান্তিপ্রিয় লোক। সংসারে কোন ঝামেলা ছিল না। শুধু প্রয়োজন ছিল একটা শিশুর। সারাদিন কোন কাজ থাকতো না হাসি দেবীর। তখন মনে হতো একটা দুষ্টু ছেলে দুষ্টুমী করে বেড়ালে বোধহয় তিনি কিছু কাজ পেতেন। সুখ দুঃখে কেটে যাচ্ছিলো দিনগুলো। তারপর হঠাৎ নেমে এলো সেই বিভীষিকার কালো রাত। মুজিবর রহমানের ডাকে গ্রামের নিরীহ মানুষ বেরিয়ে এলো সশস্ত্র সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়তে।

মানুষটার চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকা। কখন পাক ফৌজ এসে হানা দেয়। সেদিন বিকেল থেকেই একটা গণ্ডগোল চলতে থাকে। রাতের অন্ধকারে লোকে চলাফেরা করে, দিনের বেলায় রাস্তা ঘাট খাঁ খাঁ করে। মাঝে মাঝে পাক ফৌজের টহলদারী জীপ ধুলো উড়িয়ে চলে যায়। মুক্তি ফৌজের সাথে পাক সৈন্যের মোকাবিলা হয় রাতের অন্ধকারে। দোকানপাট চলতো রাতের অন্ধকারে পেছনের

দরজা দিয়ে। তারপর এলো সেই মহানিশা। মানুষটা সন্ধ্যেবেলা বাজার করতে গিয়ে আর ফিরে এলো না। বিয়ের পর সেটাই বোধহয় প্রথম রাত হাসি দেবীকে একা কাটাতে হয়েছিল। বিনিদ্র উৎকণ্ঠায় হাসি দেবীর বুকখানা বার বার কেঁপে উঠেছিল।

—মা আপনার চা। লক্ষ্মীর মা চা রেখে চলে যায়।

অন্যমনস্কভাবে হাসি দেবী চায়ে চুমুক দিতে থাকেন। চিন্তার স্রোত আবার পেছন দিকে বইতে থাকে। দুটো দিন ঘরে যা ছিল তাই খেয়ে কোনরকমে কাটিয়ে হাসি দেবী বুঝতে পেরেছিলেন, মানুষটার ফিরে আসবার আর কোন আশা নেই। দল বেঁধে গ্রামের মানুষ চলে আসছে ভারতের দিকে। আর কোন ঝুঁকি না নিয়ে কয়েকটা টাকা সম্বল করে হাসি দেবীও একটি দলের সাথে ভারতের মাটিতে এসে পা দেন।

অনেক খুঁজে পেতে রামরাজাতলায় তার বোনপো মণিময়ের বাড়ি খুঁজে বার করেছিলেন। দুটি সন্তানের জনক মণিময় তার স্ত্রীর ভয়ে জুজু হয়ে থাকতো। তার ওপর বহুদিনের ছিন্ন সম্পর্ক এক মাসীমার আবির্ভাবে সে মোটেই খুশী হল না। অথচ ওখানে ওঠা ছাড়া হাসি দেবীর আর কোন পথও ছিল না।

মণিময়ের স্ত্রী ছায়া প্রায়ই শোনাতো কত অল্প আয়ে তাকে সংসার চালাতে হয়। এদিকে রেবতীরও বিয়ের বয়েস হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। প্রথমে আকারে ইঙ্গিতে, পরে প্রকাশ্যভাবেই বলতো—এ সংসারে উটকো বোঝা বওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

দুঃখে অপমানে হাসি দেবীর ভেতরটা রিনরিন করে উঠতো। কিন্তু ভেতরের জ্বালা তিনি বাইরে প্রকাশ করতেন না। ঠিক সেই সময় ঘটলো ঘটনাটা।

একটি লোককে প্রায়ই যাতায়াত করতে দেখেন হাসি দেবী। জানা গেল রেবতীর জন্য সে নাকি পাত্রের সন্ধান আনছে। মণিময় খুশি খুশি। কেন না পাত্রী পছন্দ হলে নাকি দেনা-পাওনায় আটকাবে না। সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরবাড়ি যাওয়া হাসি দেবীর অভ্যাস। অদৃশ্য ওই শক্তিই এখন একমাত্র অবলম্বন। সেদিন ঠাকুরবাড়ি থেকে ফেরার পথে তার সামনে এসে দাঁড়ালো সেই লোকটি। সৌজন্যের হাসিতে বলে— আপনার সাথে কয়েকটা কথা ছিল মাসীমা।

—বলো বাবা।

—একটু ওপাশে চলুন।

রাস্তা ছেড়ে একটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ায় ওরা। লোকটি আস্তে আস্তে বলে—আপনাকে দেখলে খুব দুঃখী বলে মনে হয়।

লোকটির কথায় হাসি দেবীর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। প্রশ্ন এবং উত্তর। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসি দেবী নিজের কথা বলে ফেলে। সহানুভূতিতে লোকটি ধরা গলায় বলে— আপনি একটা চাকরি করবেন মাসীমা?

হাসি দেবী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। লোকটি বলতে থাকে—চাকরিটা খুবই সহজ। শুধু একটু বুদ্ধি করে কথা বলা আর কি? আপনাকে মা সেজে থাকতে হবে। একটু অভিনয় করতে হবে। তার বদলে আপনাকে একটা বাড়ি দেওয়া হবে থাকতে। আর তার সাথে অবিশ্বাস্য অঙ্কের পারিশ্রমিক।

চমকে ওঠেন হাসি দেবী। হতবাক্ হয়ে চেয়ে থাকেন লোকটির দিকে। লোকটি আবার বলে—সত্যি কথা বলতে কি আপনাকে দেখে আমারই আপনার ছেলে হতে ইচ্ছে করছে। কি দরকার এত অপমান সহ্য করে অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকা? একটু গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতে হবে আপনাকে। ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ আপনার আসল পরিচয় জানতে না পারে।

হতভম্ব হাসি দেবীর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয় না। লোকটি নিজে থেকেই বলে--আপনি ভাববার সময় নিন। দিন সাতেকের পরে আমি আবার আসবো। একটা অনুরোধ, এ নিয়ে কারও সাথে কিছু আলোচনা করবেন না।

লোকটি চলে যায়। স্তব্ধ হাসি দেবী আগা মাথা কিছু বুঝতে না পেরে বাড়ির দিকে এগোতে থাকে।

এরই মধ্যে ঘটে যায় একটা ঘটনা। হাসি দেবী যখন কাজটা নেবেন কি নেবেন না ভাবছেন, সেই সময় পাশের ঘর থেকে ছায়ার এক টুকরো কথা ভেসে আসে। মণিময়কে উদ্দেশ্য করে সে বলছে—মাছ না হলে তোমার ছেলেমেয়েদের মুখ হাঁড়ি হয়ে যায়। অথচ

বাড়ির মধ্যে যে একজন বিধবা সধবা সেজে বসে আছে, তার পাতে মাছ দেওয়ার পর আর তোমার ছেলেমেয়েদের মুখে মাছ দেবো কি করে ?

চকিতে একটা বিদ্যুৎ খেলে যায় হাসি দেবীর শিরায় শিরায়। তাইতো, এ কথাটা তো তার এতদিন মনে হয়নি! মানুষটা নিশ্চয়ই বেঁচে নেই, থাকলে তাকে একলা ফেলে পালাতো না! সুতরাং সে তো বিধবাই। সধবা সেজে থাকা তো তার অপরাধ। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে এবার থেকে থান পরে সে বিধবার আচার আচরণই পালন করবে। অপ্রতিরোধ্য কান্না বেরিয়ে আসে বুক ঠেলে। এমন সময় ঘরে ঢোকে রেবতী। শান্ত ঋজু গলায় বলে—দিদা, তোমার অন্য কোন যাবার জায়গা থাকলে চলে যাও। মায়ের এত অপমান তুমি সহ্য করো কি করে? তুমি চলে যাও দিদা। যেখানে পারো চলে যাও। দু'চোখ জলে ভরে ওঠে রেবতীর। এ সংসারে তবু এই মেয়েটাই হাসি দেবীর দুঃখ একটু বোঝবার চেষ্টা করে।

একদিকে দু'মুঠো ভাতের জন্য অসহনীয় অপমান, অন্যদিকে একটু অভিনয়ের বদলে নিশ্চিন্ত আরাম। হাসি দেবীর চিন্তাক্লিষ্ট মন দোটানায় দুলতে থাকে। রেবতীর মাথায় হাত রাখেন হাসি দেবী। কি এক প্রতিজ্ঞায় মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে। রেবতীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেন—কাঁদিস না দিদিভাই। আমি চলে যাবো। বিয়ে হয়ে গেলে শুধু তোর এই হতভাগিনী দিদার কথা মনে রাখিস। জীবনের কোন নিঃসঙ্গ মুহূর্তে যদি তোর কাছে যাই তাড়িয়ে দিস না।

নিয়মিত ঠাকুরবাড়ি যাতায়াতের পথে আবার লোকটির সাথে দেখা হয়। প্রস্তাবে সম্মতি দিতেই লোকটি সবকিছু খুলে বলে। শুনে হাসি দেবীর গা-হাত-পা কাঁপতে থাকে। লোকটি বুঝতে পেরে অভয় দিয়ে বলে—আপনার কোন ভয় নেই মাসীমা। আপনার নিরাপত্তার সব দায়িত্ব আমাদের।

কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনে বাঁচাই হাসি দেবীর কাছে সব থেকে বড় মনে হয়। মনে মনে অদৃশ্য দেবতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে দৃঢ়স্বরে বলেন—এর বিনিময়ে আমার একটা দাবি আছে।

—বলুন।

—আপনাকে আমি রেবতীর বিয়ের ব্যাপারে যোগাযোগ করতে দেখেছি। এও যদি সাজানো বিয়ে হয় তবে রেবতীকে আমি ভিক্ষে চাইছি।

লোকটি চিন্তিত মুখে বলে—আচ্ছা। দিন তিনেক পর আপনাকে আমি জানাবো। তবে মনে রাখবেন মাসীমা, আমিও পেটের দায়ে এই কাজ করছি। তবু আপনার কথা আমি সাধ্যমতো বোঝাবার চেষ্টা করবো।

লোকটি চলে যায়। ঠিক তিন দিন পর আবার সে আসে। চিন্তিত মুখে হাসি দেবী তার দিকে তাকাতেই লোকটি হেসে জবাব দেয়—আপনার আবেদন মঞ্জুর। এবার আপনি তৈরি থাকুন। দুদিনের মধ্যে আপনাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

কয়েকদিন পরে ডাকে জবাব আসে পাত্রের অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হওয়ায় তারা দুঃখিত। মণিময় নিজের দুর্ভাগ্যের সাথে রেবতীর দুর্ভাগ্যকেও দোষারোপ করতে থাকে। ছায়া চেঁচিয়ে বলে—যেদিন তোমার মাসীমা এ বাড়িতে এসে ঢুকেছে সেদিনই জানি আমার সংসারে শনি ঢুকেছে।

রেবতী বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদে। হাসি দেবী নিঃশব্দে এসে ওর মাথায় হাত রাখেন—ওঠ রেবু। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। মনে কর, এ বিয়ে না হয়ে তোর ভালই হয়েছে।

রেবতী দিদার বুকে মাথা রাখে।

—মা, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এবার উঠুন। লক্ষ্মীর মা'র মৃদু আবেদন ভেসে আসে।

—হ্যাঁ উঠি। হাসি দেবী ওঠেন। ঠাকুরঘরে ঢোকেন। একমনে ভাবতে ভাবতে বলেন—এ আমায় তুমি কোথায় নিয়ে চলেছো ঠাকুর। ফেলে আসা অতীত যেন আবার অন্য ভাবে ফিরে আসতে চাইছে। এক মুঠো ভাতের জন্য যে পেশা গ্রহণ করেছি, সেই জীবনই যেন আমার কাছে লোভনীয় হয়ে উঠেছে। যে মানুষটা শালগ্রাম আর অগ্নি সাক্ষী রেখে বিয়ে করেছিল, সে হারিয়ে গেল। কিন্তু তার জায়গায় যে অভিনয় করতে এলো, স্বামী হিসেবে তার আকর্ষণও তো কম নয়। আমার ওপর তার অসীম সহানুভূতি, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। থেকে থেকে হারিয়ে যাওয়া

মানুষটার কথা মনে করিয়ে দেয়। কোন বিচলতা নেই। সংযত গলায় অভিনেতা স্বামী শুধু বলেছিল—আমার সাথে আপনার কোন পরিচয় নেই। সাজ বদল করে আজ আমরা স্বামী-স্ত্রী। তবু একটা ভরসা আপনাকে দিতে পারি, অশালীন আচরণের দিক থেকে আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

অদ্ভুত পুরুষ। পাশাপাশি একটি অপরিচিত পুরুষের পাশে শোওয়ার পর হাসি দেবীর মন থেকে সন্দেহের কালো মেঘটা কেটে গেল। অবশ্য অবিশ্বাসী হলেও হাসি দেবীর কিছু করার ছিল না। অভিনয় হলেও শর্তানুযায়ী ওই লোকটিই তাঁর স্বামী। কিন্তু আশ্চর্য, কখনও ঘুমের ঘোরেও তার হাত হাসি দেবীকে স্পর্শ করেনি। উপরন্তু আচার আচরণে স্নেহপূর্ণ ভালোবাসার সংমিশ্রণ।

অভিনয় চলাকালীন সময়টুকু একান্ত নিজের করে পেতে ইচ্ছে করে। শুভ্রাংশুর মতো যুবক তাঁর ছেলে, আর প্রিয়ব্রতর মতো একটি সহানুভূতিশীল মানুষ তাঁর স্বামী। বার বার মনে হয় এরা কেন সত্যি হলো না? একটা মিথ্যে সংসার; শিশুবেলার বর-বৌ খেলার মতো। কেমন যেন একটা দুর্বলতা অনুভব করে প্রিয়ব্রতর জন্য। জানতে ইচ্ছে করে, কোথায় থাকেন তিনি। এখানে সম্পূর্ণ একলা থাকে হাসি দেবী। এলেও তো পারে। কিন্তু কৌতূহল প্রকাশ আইন-বিরুদ্ধ। পেশার শর্তানুযায়ী স্বাধীন চিন্তা ব্যক্ত করা অপরাধ।

আহ্নিকে মন বসে না। ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে উঠে পড়েন। রাত নেমে আসে। নিঃশব্দ রাত্রে একা বিছানায় নিজেকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হয়। আর একটা মানুষের পাশে অভ্যস্ত শোওয়া এখন যেন অস্বস্তিকর মনে হয়। ভোরবেলা মৃদু ডাকে হাসি দেবীকে জাগাতেন প্রিয়ব্রতবাবু। গভীর স্নেহভরা সে ডাক—ওগো শুনছো। ভোর হয়ে গেছে। ওঠো।

অগোছালো বেশবাস গোছাতে গোছাতে হাসি দেবীর মুখ রাঙা হয়ে যেতো। বুড়ো বয়সেও যেন একরাশ লজ্জা তাঁকে ঘিরে ধরতো। তুমি তুমি করে ডাকতে ডাকতে ওঁরা ওই ডাকেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই যে হাসি দেবী একদিন কৌতূহল বসেই জিজ্ঞাসা করেন—আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করছি। এ জীবন তোমার কেমন লাগে?

—ভালোই তো। তবে এটা আমাদের ত্বজনেরই চাকরি। সবটাই অভিনয়। তবু এই অভিনয় আমার ভালো লাগে। শুধু লোক ঠকানোটুকু বাদ দিলে এর থেকে সুন্দর আমার জীবনে আর কিছু নেই।

বাইরে গাঢ় অন্ধকার। উদ্‌ভ্রান্ত জোনাকিরা পাক খায়। সেদিকে চেয়ে হাসি দেবীর বুক চিরে বেরিয়ে আসে দীর্ঘনিশ্বাস। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়েন।

॥ সাত ॥

শরীরটা খারাপ লাগছে সীমা বোহরার। উচাটন মন। আজকের মতো এমনই একদিনে সুরিন্দরের সাথে ওর বিয়ে হয়েছিল। অথচ আজ ও মিসেস বোহরা। ত্বটি পুরুষের কি অদ্ভুত ত্বটি প্রকৃতি! একজনের পাহাড়ের মতো অটল প্রতিজ্ঞার কাছে আর একজনের সমস্ত পৌরুষ আত্মসমর্পণ করলো।

সুরিন্দরের সাথে বিয়ের পর সীমা ভেবেছিল, কি জানি কেমন হবে লোকটা! কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সুরিন্দর প্রমাণ করলো সে আদর্শ স্বামী। টাকার নেশায় মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেনি। একটা বাঁধা সময় সে ব্যবসার কথা ভাবে তারপরেই সে সীমার। ঠাট্টা করে সীমা প্রশ্ন করলে সে জবাব দিতো—আমি কাজের সময় কাজ করি, খেলার সময় খেলা। বাড়িতে ফিরে এসে আমি যেমন ব্যবসার কথা ভাবি না, তেমনি কাজের মধ্যে থাকলে আমি তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখি।

অবাক্ হয়ে যেতো সীমা। ভালো লাগতো ওর নিয়মানুবর্তিতা দেখে। অটুট বিশ্বাসে চেয়ে থাকতো সুরিন্দরের মুখের দিকে। সুরিন্দর জিজ্ঞাসা করতো—কি দেখছো?

—দেখছি আমার স্বামীকে। সীমা দুষ্টুমীর হাসি হেসে জবাব দিতো।

সুরিন্দর ওকে কাছে টেনে নিতো। ত্ব'হাতের বেষ্টনীতে বেঁধে

বলতো—তুমি তোমার স্বামীকে দেখো, আমি দেখি আমার প্রিয়াকে, আমার স্ত্রীকে, আমার সাধ-আহ্লাদ সব কিছুকে। আবেশে চোখ বুজে আসতো সীমার। সুরিন্দরের বুকে মাথা রেখে বলতো—বিবাহিত জীবন যে এত সুখের হয় কল্পনাও করতে পারিনি। বাবাকে দেখতাম দিন রাত শুধু ব্যবসার কথা ভাবতে। মায়ের বিমর্ষ মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হতো এই কি জীবন? কিন্তু আমার বিয়ের সময় মা আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—আমি তোকে আশীর্বাদ করছি সীমা, তুই সুখী হবি।

—তুমি সুখী তো? সুরিন্দরের প্রশ্নে সীমার চোখে আনন্দাশ্রু ভেসে ওঠে।

—তুমি আমার পাশে থাকলে রানী এলিজাবেথের দিকেও আমি উপেক্ষার দৃষ্টিতে তাকাতে পারি।

হেসে ওঠে সুরিন্দর। ঘরের আলো নিভে যায়। সীমা আর সুরিন্দর মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

জোয়ারের জলের মতো গড়িয়ে চলছিল ওদের দিনগুলো। ব্যবসার জন্য মাঝে মাঝে সুরিন্দরকে বাইরে যেতে হতো। কিন্তু সব সময়ই সঙ্গে থাকতো সীমা। আলাপ হতো বিভিন্ন বিজনেস ম্যাগনেটদের সঙ্গে। সেইভাবেই আলাপ হয়েছিল মিঃ বোহরার সঙ্গে। যার কাছে টাকাই জীবনের সব কিছু। কখন কোথায় কিভাবে আলাপ হয়েছিল এখন আর মনে নেই। সামান্য একটা তর্ক থেকেই এসেছিল চ্যালেঞ্জ। তার ফল হিসেবে মিসেস সুরিন্দর সিং আজ মিসেস বোহরা।

তবু মনের কোথায় যেন একটা পেলব ভালোবাসা মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেয় সুরিন্দরের কথা। অবশ্য মিঃ বোহরাও যথেষ্ট আদর যত্নে রেখেছে। তবু সীমা যেন মনে প্রাণে তাকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। তার বদলে যেন একটা চাপা ভয় ভেতরে গুনগুন করে। লোকটা ইচ্ছে করলে সব পারে। দুর্নীতির ওপর দাঁড়িয়ে যে রোজগার করছে অঢেল টাকা! একদিন সীমা জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হবে এইভাবে এত টাকা রোজগার করে?

মিঃ বোহরা হেসে জবাব দিয়েছিলেন—ভারত নামক একটি বোকার রাজত্ব থেকে অনেক অনেক টাকা রোজগার করে তোমাকে নিয়ে আমি

বিদেশে পাড়ি দেবো। একটা নিশ্চিন্ত সুখের স্বর্গ। সেখানে থাকবো শুধু তুমি আর আমি। জানো সীমা, তুমি আমার ঘরে আসার পর থেকে আমার ব্যবসায় আশাতীত লাভ হচ্ছে। দুঃখ হয় সুরিন্দরের জন্য। কিন্তু কি করবো বলো, একজনের সুখের জন্য অন্যকে তো ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।

সুরিন্দর প্রথম প্রথম মদ খেয়ে এসে সীমার কাছে গোপন করতে চাইতো। সীমা ওর শিশু-সুলভ ব্যবহার দেখে বলতো—মদ খাচ্ছো খাও আমি কিছু মনে করবো না, বরং ব্যবসায়ীরা একটু আধটু মদ না খেলেই যেন কেমন বোকা বোকা লাগে। সেদিন সীমা বোঝেনি নিজের অজান্তেই সে নিজের এক সর্বনাশ করে বসলো। সীমার সমর্থনে সুরিন্দরের মদের মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে উচ্ছৃঙ্খলতাও বাড়তে আরম্ভ করলো। শুরু হলো মদের সাথে মেয়ে মানুষ এবং জুয়ার নেশা। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী শুরু হলো অনুরোধ, কাকুতি মিনতি। গভীর রাত্রে প্রায় বেহুঁশ সুরিন্দরের পায়ের পাতা ভেজে সীমার চোখের জলে। সুরিন্দরের চওড়া বুকে অনেক জল ঢেলেও সীমা ওর মন ভেজাতে পারলো না। বার বার আকুল আবেদনে ব্যর্থ হয়ে সীমা এক সময় স্তব্ধ হয়ে গেল। কান্নারও শেষ আছে, শেষ আছে অনুরোধ উপরোধ এবং অভিমানের। সুরিন্দর যেন পাষাণ হয়ে গেল। সম্মোহিত মানুষের মতো নির্লিপ্ত। ওর স্তিমিত চোখের পাশেই জেগে ওঠে মিঃ বোহরার দুটো জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি। ওর কঠিন মুখখানা যেন বলছে—জীবনে চরম মূল্য দিতে হলেও তুমি তোমার চ্যালেঞ্জ থেকে সরে দাঁড়াবে না আশা করি। না, পাঞ্জাবী তনয়া কথার খেলাপ করতে শেখেনি। প্রাণপণ লড়াই করেও যখন সে সুরিন্দরকে ফিরিয়ে আনতে পারলো না এবং যেদিন সুরিন্দর ওর গায়ে হাত তুললো, সীমা সেদিনই বুঝেছিল, ওর ভাগ্যের হাওয়া অন্যদিকে ঘুরে গেছে।

এক বৃষ্টিঝরা রাতে সুরিন্দর একটি অপরিচিতা মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ঢুকলো। সীমার চোখে সেদিন জল ছিল না। সুরিন্দর শুধু গম্ভীর গলায় বলেছিল—আমার শোয়ার ঘরে আজ রাত্রে তোমার জায়গায় এ থাকবে। তুমি ড্রয়িং রুমে একটু ব্যবস্থা করে নাও।

ঘৃণায় সীমা কোন কথা বলেনি। বৃষ্টিঝরা রাতে রাস্তায় এসে

দাঁড়িয়েছিল। সৌভাগ্যবশতঃ একটা ট্যাক্সিও পেয়ে গিয়েছিল এবং সোজা চলে আসে মিঃ বোহরার ফ্ল্যাটে। মিঃ বোহরা কিন্তু একটুও আশ্চর্য হয়নি সেদিন। শুধু বলেছিল—আমি জানতাম তুমি আসবে। দেখো, তোমার খাবার, তোমার বিছানা সব প্রস্তুত। এসো ভেতরে এসো।

কঠিন দৃষ্টিতে সীমা কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে মিঃ বোহরার দিকে। যেন পাষাণ-প্রতিমা। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে কয়েকটা কথা—আমি হেরে গেছি মিঃ বোহরা। এবার বলুন আমি কি করবো ?

—তুমি কি তোমার অতীতকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছো ? না, তাকে সুরিন্দরের ফ্ল্যাটে রেখে এসেছো ?

—অতীত আমার কাছে মৃত। বর্তমান আপনি জানেন। আর ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অজানা।

সীমার কথা শেষ হতেই এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন মিঃ বোহরা। ছুরি দিয়ে নিজের কব্জির কাছে খানিকটা কেটে ফেললেন। বেরিয়ে আসা রক্ত দিয়ে সীমার সিঁথিতে একটা রেখা টেনে দিয়ে বললেন—আজ থেকে তুমি মিসেস বোহরা।

থরথর করে কাঁপতে থাকে সীমা। এক অজানা আশঙ্কা ওকে মূক করে দেয়। মিঃ বোহরা ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—সুরিন্দরের ছায়াও কোনদিন তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এই মুহূর্ত থেকে তোমার সব দায়িত্ব আমার।

হতবিহ্বলা সীমা দ্রুত পট পরিবর্তনে স্তম্ভিত। কয়েক ঘণ্টা আগে ও পরের জীবন সম্পূর্ণ আলাদা। অথচ কি এক অদৃশ্য সুখে ভেতরে ঈষৎ রোমাঞ্চের ইশারা।

—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো সীমা ?

সীমা জবাব দিতে পারে না। শুধু নিঃশব্দে চেয়ে থাকে। চোখে করুণ আত্মসমর্পণের দৃষ্টি।

—আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে তো ?

—কিসের বিশ্বাস ? অস্ফুট স্বরে সীমা প্রশ্ন করে।

মিঃ বোহরা পরম যত্নে সীমাকে দু'হাতের বেষ্টনীতে বিছানায় বসায়। নিজেও বসে। দু'হাতের অঞ্জলিতে সীমার মুখখানা তুলে ধরে বলতে থাকে—প্রথম দিন সুরিন্দর যখন তোমার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে

দিলো, তখনই মনে মনে তোমার প্রতি এক আকর্ষণ অনুভব করি। কিন্তু তুমি সুরিন্দরের বিবাহিতা স্ত্রী। জোর করে বা অন্য কোন উপায়ে হয়ত তোমাকে পেতে পারতাম, কিন্তু তোমার মনের নাগাল কোনদিন পেতাম না। মনে মনে তোমায় ভোলবার চেষ্টাই করছিলাম। একদিন তুমিই রাস্তা দেখিয়ে দিলে, আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করে। তারপরেও আমি অনেক ভেবেছি। একবার ভাবলাম কি হবে তোমার ফুলের মতো জীবনটাকে বিপর্যস্ত করে? আবার ভাবলাম, একটি নারী কি চায় জীবনে? স্বামীর অকৃত্রিম ভালোবাসা আর সুন্দর সুখী জীবন। আমি তোমাকে দুটোই দিতে পারবো। নিজেকে নিয়ে অনেক নাড়াচাড়ার পর অনুভব করলাম আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি। ব্যস শুরু হয়ে গেল আমার অভিযান।

সমস্ত শক্তি আর বুদ্ধি দিয়ে সুরিন্দরকে আমি পাপের পথে টেনে নিয়ে চললাম। প্রথম প্রথম সুরিন্দর আমাকে প্রত্যাখ্যান করতো। অপমানিত বোধ করতাম। আবার তোমার কথা ভেবে সব অপমানকে তুচ্ছ করে দ্বিগুণ উৎসাহে সুরিন্দরের দিকে ঝুঁকতাম। চোখের সামনে দেখলাম, লোভ আর সাধুতার টাগ অব ওয়ার। সুরিন্দরও রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। একদিন দুদিন তিনদিন। সুরিন্দর একটু একটু করে এগোতে আরম্ভ করলো। আর আমি? দু'হাতে টাকা খরচের সাথে ভাবতে লাগলাম প্রলোভনের নতুন নতুন কৌশল। একদিন বুঝলাম তোমার নোঙ্গর ছিঁড়ে সুরিন্দর ভোগ-লালসার স্রোতে গা ভাসিয়ে তীব্রবেগে ছুটে চলেছে।

সীমা, সুরিন্দরের ঘর থেকে তোমাকে এনেছি সন্দেহ নেই। তবে এও প্রতিজ্ঞা করছি, ওর চাইতেও তোমাকে আমি সুখে রাখবো। ওর থেকেও বেশী ভালোবাসবো।

—কিন্তু আমি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি?

—আমি এতটুকু কুণ্ঠিত হবো না। কেন না আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি এর চেয়ে সুন্দর জীবন পাবে না। তা ছাড়া তোমার সব অপরাধ আমি ক্ষমার চোখে দেখবো। আমি যে তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি সীমা।

এক অতীন্দ্রিয় ভাবালুতায় ডুবে যায় সীমা। দু'চোখ জলে ভরে

যায়। মিঃ বোহরার বুকে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে বলে—আমি তোমার··· আমি তোমার···আমি তোমার···।

প্রচণ্ড শক্তিতে মিঃ বোহরা সীমাকে আলিঙ্গন করে। বার বার বলতে থাকে—আজ আমার বড় আনন্দের দিন সীমা। আজ তোমাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করছে। তুমি কিছু চাও। তোমার যা খুশী।

—তুমি শুধু আমাকে কথা দাও, কোনদিন আমাকে ছেড়ে যাবে না। তোমার মুখের কথার দাম আমি জানি। শুধু ওই কথাটুকুতেই আমার সব সংশয় কেটে যাবে।

—কথা দিলাম সীমা। সুরিন্দরের আইনগত অধিকার থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে আনতে হবে। ডিভোর্সে কোন অসুবিধা হবে না আশা করি। যাই হোক, সে ভার আমি নিচ্ছি।

তারপর সারারাত মিঃ বোহরা সীমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। কখনও দামাল ছেলের মতো দুস্টুমী, কখনও শিশুর মতো আবদার আবার কখনও উন্মাদের মতো জোয়ার। সীমা যেন সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, সুরিন্দরের সাথে কাটানো সময় সবটাই অপচয়।

দিনের পর দিন এক সাথে বাস করে সীমা জেনেছে মিঃ বোহরা এক জ্বলন্ত পুরুষকারের প্রতীক। বলিষ্ঠ দেহের ভেতরে এক দুর্দমনীয় বলিষ্ঠতর মন আছে। অথচ সেই লোকটিই সীমার কাছে এলে শিশুর মতো কোমল। সীমা জিজ্ঞাসা করেছে—অপরাধ করে টাকা রোজগার করার কি দরকার?

খানিকক্ষণ সীমার দিকে চেয়ে থেকে জবাব দিয়েছেন মিঃ বোহরা—পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ কোন না কোন ভাবে অপরাধী। সৎ তারাই, যাদের অপরাধ করার মতো বুদ্ধি বা সাহস নেই। আমি জানি আমাকে বাঁচতে হবে। সেই বাঁচাকে আমি রূপে, রসে, গন্ধে বর্ণময় করে তুলতে চাই। জান সীমা, আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে আমার মা মারা যান। মাতৃহন্তা কোন ছেলে কি পৃথিবীর আর কোন অপরাধে ভয় পায়? তবে হ্যাঁ, আমি বুদ্ধি খরচ করে অপরাধ করি। কেউ যদি আমার চেয়েও বেশী বুদ্ধিমান হয়, আমাকে ধরবে।

—সেদিন আমার কি হবে?

—সীমা, তোমার সব দায়িত্ব যখন আমি নিয়েছি, তখন তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।

সীমা আর কোন কথা বলেনি। দুর্বার গতিতে মিঃ বোহরা ছুটে চলেছে। টাকা আসছে স্রোতের মতো। প্রথম প্রথম সীমার খুব ভয় করতো। এখন অনেকটা সয়ে গেছে। মিঃ বোহরার কল্যাণে পৃথিবীর অনেক জায়গা দেখবার সুযোগ হয়েছে সীমার। যা সে জীবনে কোনদিন চিন্তাও করতে পারেনি। অবাক্ হয়ে গেছে মানুষটার ক্ষমতা দেখে। পৃথিবীর যে কান কাজ যেন সে অনায়াসে করতে পারে।

সামার অবাক্ চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছে মিঃ বোহরা—তোমার কি চাই সীমা ?

সীমা গভীর চোখে তাকিয়ে থেকে শুধু জবাব দিয়েছে—তোমাকে।

তখনই আরম্ভ হয়েছে মিঃ বোহরার শিশুসুলভ চপলতা। সীমার চোখে চোখ রেখে জানতে চেয়ে ছ, তুমি সুখী তো? তুমি আমাকে ভালোবাসো ?

এ প্রশ্নের উত্তর সীমা মুখে দেয়নি। দিয়েছে অন্যভাবে।

॥ আট ॥

মিঃ বোহরার অফিসঘরে বসে আছে সুধীর হালদার। ইনফর্মার। খবর সরবরাহ করা যার কাজ। বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে ঘুরে সে খবর নেয় কোথায় সুন্দরী যুবতী আত্মীয় বা অনাত্মীয়ের কাছে গলগ্রহ হয়ে আছে। অথবা বুড়ো বাবা-মা ছাড়া যে মেয়ের আর কোন নিকট আত্মীয় নেই। কাজটা ওপর থেকে দেখতে সোজা হলেও আসলে বেশ কঠিন। খবর সংগ্রহে ভুল থাকলে যে কোনরকম বিপদ ঘটতে পারে। সেই কারণেই সুধীর হালদার মিঃ বোহরার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

—হালদার, বেশ কিছুদিন কোন নতুন খবর আনতে পারছো না। কি হলো, বাংলাদেশে কি অরক্ষণীয়া মেয়ের আকাল পড়লো নাকি ?

—বহরমপুরে একটা খবর পেয়েছি। তবে ওখানে গিয়ে কয়েকদিন না থাকলে ব্যাপারটা জানা যাচ্ছে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আমার হাতে একদম টাকা নেই। আজ কিছু টাকা দেবেন স্যার।

—আপাততঃ কত হলে চলবে?

—অন্ততঃপক্ষে হাজারখানেক।

—ঠিক আছে দেবো। এবার বহরমপুরের ব্যাপারটা বলো।

—মেয়েটি মামাবাড়িতে থাকে। বাবা নিরুদ্দেশ। মুর্শিদাবাদে ওদের একটা মুদির দোকান ছিল। মাস-ছয়েক জমানো টাকা এবং ধার দেনা করে চালিয়ে মহিলা মেয়েটিকে নিয়ে বহরমপুরে ভাইয়ের বাড়িতে চলে আসে। মেয়েটির বয়েস এখন সতের আঠার। ইতিমধ্যে মহিলাটির যক্ষ্মা হয়েছে। সুতরাং ভাইয়ের বাড়িতে তার আদর-যত্ন কেমন হচ্ছে বুঝতেই পারছেন। তবে স্যার সবটাই শোনা। ওখানে গিয়ে ভেরিফাই না করলে আপনাকে সঠিকভাবে কিছু বলতে চাইছি না।

—এ ব্যাপারে বিয়ের ঘটনার কোন দরকার নেই। মেয়েটিকে চাকরির লোভ দেখালেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে। তুমি সেই ভাবেই এগোবে। ভালো কথা, কলকাতা সম্বন্ধে মেয়েটির কোন ধারণা আছে কিনা জেনে নেবে।

—ঠিক আছে স্যার।

টাকাটা পকেটে নিয়ে সুধীর হালদার বেরিয়ে আসে। কলুটোলা স্ট্রীটে মকবুলের সঙ্গে সে এক সাথে থাকে। মকবুল হোসেন চৌধুরী। সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমান। পাকিস্তান আমলে বর্ডারে চোরা-কারবারের সাথে যুক্ত ছিল সে। খুলনায় সুধীর হালদারের সাথে একই গ্রামে থাকতো। গ্রামের সবাই মনে মনে জানলেও মুখে কিছু বলতো না। বহু লোক বিপদের সময় মকবুলের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আর ফেরত দেয় নি। মকবুলও চাইতো না।

সেই মকবুল শেষ যেবার গ্রামে গেল আর বেরিয়ে আসতে পারলো না। এক সন্ধ্যায় হঠাৎ পাকিস্তানী সৈন্যের অতর্কিত আক্রমণে গ্রামসুদ্ধ লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে লাগলো। ঘনায়মান অন্ধকারে বৌয়ের হাত ধরে ছুটল মকবুল। সেই রকম এক মুহূর্তে সুধীরের সাথে দেখা হয় মকবুলের। সুধীরও মকবুলের সাথে ছুটতে থাকে। অন্ধকার রাস্তায়

ভালো করে পথ দেখা যায় না। হঠাৎ পেছন থেকে বন্দুকের গুলির আওয়াজ। ভয়ে মকবুলের বৌ রাস্তায় বসে পড়ে। পেছনে শোনা যায় ভারী বুটের আওয়াজ। অনেক অনুরোধ উপরোধ করেও মকবুলের বৌকে ওঠানো গেল না। হাউ হাউ করে সে শুধু কাঁদে। সুধীর আর মকবুল অগত্যা রোকেয়াকে রেখেই ছুটতে থাকে। পেছনে তাকানোর সময় নেই। সামনেও একটা জীপ এগিয়ে আসার শব্দ। সেই সাথে জোরালো আলো। ওরা রাস্তা ছেড়ে পাশের একটা জঙ্গলের পেছনে লুকোয়। কিছুক্ষণ পরেই রোকেয়ার বুকফাটা আর্তনাদ। একটা আওয়াজ তুলে জীপটা চলে যেতেই আবার সব চুপ। মকবুলের শক্ত চোয়াল। শুধু দুই চোখ দিয়ে দুটো জলের ধারা নেমে আসে। সুধীর থাকতো দাদা-বৌদির সংসারে। হঠাৎ আক্রমণে ওরা কোথায় ছিটকে গেছে সুধীর জানে না। অনেক কষ্টে পায়ে হেঁটে ওরা ভারতে এসে উঠেছিল। কোথাও আশ্রয় নেই। শেষে মকবুলের এক শাগরেদের খোঁজ পাওয়া গেল কলুটোলা অঞ্চলে। সেখানেই একটু আশ্রয় পাওয়া গেল। চলতি পথের অসহায় মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা, সোনা-দানা, ঘড়ি ছিনতাই করে আনা টাকায় কয়েকটা দিন চললো। তারপর মকবুল ফিরে গেল তার পুরানো ব্যবসায়ে আর সুধীর হালদারকে দলে টেনে নিলেন মিঃ বোহরা। চোরাকুঠুরীর মতো ছোট্ট ঘরখানা অনেক সময় তালা বন্ধই পড়ে থাকে।

নেহাত জৈবিক তাড়নায় বিভিন্ন বেশ্যালয়ে ঘুরতে ঘুরতে সোনাগাছির এক ঘরে রোকেয়াকে আবিষ্কার করে সুধীর হালদার। সেই রাতে রোকেয়ার পাশে শুয়ে সে ফেলে আসা অতীতের ইতিহাস শুনেছিল। পাঠান সৈন্যদের অমানুষিক অত্যাচারে ভারতে এসে অনেক টাকা খরচ করে তাকে চিকিৎসা করাতে হয়েছে। এখন তার হাতে অনেক টাকা। পাশে শুয়ে গল্প করলেও সুধীর রোকেয়ার গায়ে হাত দিতে চায়নি। রোকেয়া বলেছিল—সতীত্ব যখন গেছেই তখন তুমি আর নিজেকে বঞ্চিত করছো কেন! আমার ঘরে না এলে তোমাকে তো অন্য ঘরে যেতেই হবে। তার চেয়ে তুমি আমার ঘরেই এসো। আমিও জানবো গাঁয়ের মানুষ। তোমার টাকাটাও গাঁয়ের মেয়েমানুষের কাজে লাগবে।

সুধীর একবার মকবুলের কথা তুলতেই রোকেয়া ওর মুখে হাতচাপা

দিয়েছিল—তুমি হিঁদু। তোমার দুগ্‌গা পিতিমের দিব্যি রইল, ওর কাছে আমার কথা বলো না। মানুষটা দুঃখ পাবে। ও জানে আমি মরে গেছি। ওর কাছে মরাই থাকতে চাই।

তারপর থেকে সুধীর আর অন্য ঘরে যায় না। সপ্তাহে দু' একদিন সে রোকেয়ার ঘরেই রাত কাটায়। রোকেয়া মাঝে মাঝে এটা ওটা রান্না করে মকবুলের জন্য পাঠিয়ে দেয়। মকবুল খেতে খেতে আনমনা হয়ে জিজ্ঞাসা করে—কোন্ হোটেলের রান্না রে সুধীর?

সুধীর এক একদিন এক এক হোটেলের নাম করে।

মকবুল নিঃশব্দে খেতে থাকে আর মাঝে মাঝে ভিজে চোখের পাতা মোছে। ওর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে সুধীর হালদার পাশ ফিরে শোয়।

পকেটে নগদ এক হাজার টাকা। কলুটোলার খুপরী ঘরে ধোঁয়া জমা অন্ধকার ভালো লাগে না সুধীরের। এক অদৃশ্য টান অনুভব করে। মকবুলের সাথে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায় সুধীর। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে মকবুলের কান্না শুনে ঘুম ভেঙ্গে যায়। গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞাসা করে—কাঁদিস কেন?

একবুক বাতাস খালি করে মকবুল জবাব দেয়—বর্ডার পার হয়ে এখনও অনেক মানুষ ইণ্ডিয়ায় আসে। আমি চোখ রাখি যদি রোকেয়া কোনদিন আসে। একদিন জানিস একটা মেয়ে ইণ্ডিয়ায় আসছিল। রাতের অন্ধকারে সম্পূর্ণ একা। আমার মনে হলো রোকেয়া। আমি মাল রেখে রাস্তার অবস্থা দেখছি। এমন সময় তিনজন বর্ডার পুলিস ওকে ধরলো। আমি থাকতে পারলাম না। লাফিয়ে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পুলিসগুলো আমার চেনা। মাল পাচারের সময় ওদের পয়সা দিতে হয়। সোজা গিয়ে বললাম—ওকে ছেড়ে দিন। ও আমার বিবি। পুলিস তিনজন অবাক্। টর্চের এক ঝলক আলোয় আমাদের চোখাচোখি হলো। বুঝলাম আমি রোকেয়াকে চিনতে ভুল করিনি। ও তখন আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। পুলিস তিনজনকে গোটা-পনের টাকা দিতেই ওরা চলে গেল। আমি এবার পাশে দাঁড়ানো মহিলার ঘোমটা তুলে বললাম—রোকেয়া, তুই আমাকে চিনেছিস?

ঘোমটার ভেতর থেকে খিলখিল হাসির সঙ্গে ভেসে এলো—আমার অনেক নাম আছে। তুমি যে নামে ডাকবে সেটাই আমার নাম। হারামীগুলো চলে গেছে। এবার যা করবার করো। আমার রেট কিন্তু পাঁচ টাকা।

আমি আর দাঁড়ালাম না। মাল কাঁধে নিয়ে বাংলাদেশে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলাম—শালা রোকেয়াও বেশ্যা হয়ে যায়নি তো ?

মকবুলের শেষ কথাটায় চমকে ওঠে সুধীর হালদার। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—তোর কি মনে হয় রোকেয়া এখনও বেঁচে আছে ?

মকবুল হেসে ওঠে। সুধীর অন্ধকারেও ওর হাসি দেখতে পায়।

—জানিস সুধীর, ও মরে গেলে আমি সব থেকে খুশী হব।

—ঘুমিয়ে পড় মকবুল, অনেক রাত হলো।

তেলচিটে বালিশের ওপর মাথা রেখে সুধীরের মনে হয় অনেক রাত হয়ে গেছে। খিদেও পেয়েছে। ধোঁয়াভরা খুপরী থেকে বেরিয়ে এসে বুক ভরে নিশ্বাস নেয়। নগদ এক হাজার পকেটে। গাঁয়ের মানুষের টান অনুভব করে। নিজের মনেই বলে—আমি যাচ্ছি রোকেয়া···আমি যাচ্ছি।

সোনাগাছির তেত্রিশ নম্বর ঘর। আলো নেভানো। সুধীর দরজার কাছে দাঁড়ায়। মনে হয় ঘরে খদ্দের আছে। সুধীর একটা সিগারেট ধরিয়ে খানিকক্ষণ পায়চারি করে। কাজলির ঘর থেকে খদ্দের বেরিয়ে আসে। পেছনে পেছনে কাজলি। খদ্দেরের হাত ধরে বলে—আবার এসো। দেখে মনে হয় টাঙ্গাওয়ালা। শালা সারাদিন গাড়ির মাথায় চেপে সন্ধ্যেবেলা মেয়েমানুষে চাপে। পান খাওয়া দাঁত বার করে হেসে কাজলির গাল টিপে বলে—হাঁ। আবার আসবো। তুর কাছে আসলে বোড়ো সুখ হোয়।

সুধীরের দিকে চোখ পড়ে কাজলির। কাছে এসে মুচকি হেসে বলে —ও, তেত্রিশ নম্বরের নাগর। তা তোমার মাগের তো জ্বর হয়েছে। সন্ধ্যে থেকে অনেক খদ্দের ফিরিয়ে দিয়েছে। তোমাকেও ঢুকতে দেয়নি বুঝি ? আহা, আজ রাত্রিটা না হয় আমার সঙ্গেই কাটাও।

—ওর জ্বর হয়েছে ? উত্তরের অপেক্ষা না করে দরজায় ঠেলা দেয়। ভেজানো দরজা খুলে যায়। অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে উত্তর আসে—আজ হবে না। আমার জ্বর হয়েছে। অন্য ঘরে যাও।

আলো জ্বালে সুধীর।

—কে? কাতর কণ্ঠ বেরিয়ে আসে রোকেয়ার মুখ থেকে।—ও তুমি? তোমার জন্যই তো দোর খুলে রেখেছি। দোর বন্ধ করে আমার কাছে এসো।

সুধীর কাছে এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখে বেশ গরম। জিজ্ঞাসা করে—ওষুধ-বিষুধ কিছু খেয়েছো?

—না। সেই জন্যই তো তোমার আশায় বসে আছি। একটু কাজ করো আমার জন্য। আমার অসুখের কথা বলে একটু ওষুধ এনে দাও। আমাকে যে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে হবে! অনেক খদ্দের ফিরে গেছে। অসুখ হলে আমাদের অনেক ক্ষতি।

সুধীর আর দাঁড়ায় না। ওর কাছ থেকে বিবরণ শুনে ওষুধ আনতে বেরিয়ে যায়!

সারা শরীর ব্যথা। মুখ তেতো। রোকেয়া ভাবে এ সময় মকবুল থাকলে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। সারাদিন ওর পাশে বসে সেবা করতো। আর ওই হারামীর বাচ্চা খান সেনারা? একশ দুই জ্বরের মধ্যেও ওকে রেয়াৎ করতে ছাড়েনি।

সুধীর ওষুধ নিয়ে ফিরে আসে। গ্লাসে ঢেলে রোকেয়াকে খাইয়ে দেয়। খানিকক্ষণ মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার পর বলে—আজ তাহলে চলি?

—না না, তুমি যেও না। তোমার রাতের সঙ্গী আমি হবো। আমার সাথে শুতে ইচ্ছে না করলে পাশের ঘরে পাখি আছে, ওকে ডেকে আনবো। তোমরা আমার ঘরেই শুয়ো।

—কি বলছো তুমি? তোমার অসুস্থ শরীরে কি হাত দিতে পারি?

—আমার কোন অসুবিধে নেই। তোমার জন্যই পাখির কথা বললাম।

—শোন, তোমার কাছে টাকা পয়সা আছে? না কিছু রাখবে?

—আছে আছে। এ লাইনে নামলে টাকার অভাব হয় না। তাইতো মাঝে মাঝে তোমার বন্ধুর কথা মনে হয়। টাকার অভাবে মানুষটা···যাক গে, পাখিকে খবর দিয়ে আসি।

রোকেয়া বিছানা ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করতেই সুধীর ওকে ধরে শুইয়ে দেয়। মুখে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে—আমি তোমার সাথেই শোবো। অন্য কাউকে ডাকার প্রয়োজন নেই।

রোকেয়া শুয়ে পড়ে। সুধীর ওর সারা গায়ে হাত বোলাতে থাকে। রোকেয়ার মনে হয় ও যেন সেই গ্রামের ঘরে শুয়ে আছে। পাশে মকবুল। রোকেয়া মকবুলকে নিজের বুকে টেনে নেয়।

ধাবমান ট্রাকের ইঞ্জিনের শব্দ এবং মানুষের কোলাহলে ঘুম ভেঙে যায় সুধীরের। বন্ধ দরজার ফাঁক ফোকর দিয়ে ঘরে ভোরের আলো ঢোকে। সুধীর চোখ রগড়ে উঠে বসে। পাশে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে রোকেয়া। সুধীরের আদিম ইচ্ছেটা আবার জেগে ওঠে। গায়ে হাত দিয়ে দেখে জ্বর ছেড়ে গেছে। রোকেয়ারও ঘুম ভেঙে যায়। অলস চাহনিতে একবার চেয়ে সুধীরকে কাছে টেনে নেয়।

সুধীর বেরিয়ে আসে বাইরে। বিস্বাদ তেতো মুখ। একটা চায়ের দোকানে ঢোকে। ওর সামনে সোনাগাছির গলির মুখ। রাত্রে এখানকার মানুষ জেগে ওঠে। দিনে নিঝুম ঘুমন্তপুরী। কালো অন্ধকারে ওরা রূপসী। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো মানুষ ছুটে আসে এখানে। একমুঠো টাকার বিনিময়ে রোকেয়ারা নিজেদের তুলে ধরে পুরুষদের সামনে। আর পুরুষেরা?···

নিজের ওপরেই রাগ হয়। কাল রাত্রে ও নিজেও তো অসুস্থ রোকেয়াকে ছাড়েনি?

চা খেয়ে সুধীর কলুটোলার দিকে হাঁটতে থাকে। কাল রাত্রে মকবুলের ফেরার কথা ছিল। নিশ্চয়ই এখন ঘুমোচ্ছে। সেণ্ট্রাল এভিন্যু দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে, এই বিশাল শহরে কত কিছু ঘটে যাচ্ছে। এক অলিখিত ইতিহাস। এই ইঁট কাঠ পাথরেরা যদি কথা বলতে পারতো, তাহলে সভ্য জগৎ নিজেদের কাণ্ড কারখানার কথা শুনে নিজেরাই আঁতকে উঠতো।

মিঃ বোহরা, এক অপরাধের জগতে যার বাস, অথচ ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। নিষ্কলুষ এক একটি মেয়ে ওর জালে ধরা পড়ছে, বিভিন্ন পতিতালয়ে রোকেয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে আর তার বিনিময়ে মিঃ

বোহরার পকেটে আসছে হাজার হাজার টাকা। অপরাধীদের মধ্যে সুধীর নিজেও একজন। কোথায় ছিল আজ কোথায় এসে ঠেকেছে! মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ওর কাজ। কবে শেষ হবে এই খেলা? যদি ধরা পড়ে? হঠাৎ ট্রাফিক পুলিসের দিকে চোখ পড়তেই বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। নিজেকে জনতার ভিড়ে লুকিয়ে ফেলে।

না, তাকে ধরা পড়লে চলবে না। মাথার ওপরে একটা কাক বিশ্রীভাবে ডেকে ওঠে। সুধীর তাকাতেই কাকটা উড়ে গেল। সুধীর আবার ব্যস্ত মানুষের মতো হনহন করে চলতে থাকে।

কলুটোলার খুপরী ঘরটার সামনে যেতেই লুঙ্গি পরে বেরিয়ে আসে মকবুল। সুধীরকে সামনে দেখেই জিজ্ঞাসা করে—চা খেয়েছিস?

—হ্যাঁ। সুধীর জবাব দেয়।

—আরেক কাপ চলবে?

—তা চলতে পারে।

—তাহলে তুই ভেতরে বোস। আমি চা আর জলখাবার নিয়ে আসি।

সুধীর ঘরে ঢোকে। মকবুলের বালিশটা পাতা। সুধীর টান টান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। হঠাৎ অনুভব করে বালিশটা যেন ভিজে ভিজে লাগছে।

বাইরে অনেক আলোর মধ্যেও খুপরী ঘরখানা আবছা অন্ধকার। সুধীরের বুক ঠেলে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। মাথার নীচ থেকে বালিশটা সরিয়ে এমনিই শুয়ে থাকে।

॥ নয় ॥

সূর্য সেন স্ট্রীটের একটা বোর্ডিং হাউসের বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল অনিমেষ চক্রবর্তী। পড়ন্ত রোদের লাল আভা ইউনিভার্সিটি বিল্ডিংএর মাথায়। রক্তাভ মেঘের ছায়া কলেজ স্কোয়ারের জলে। তেতলার এই ঘরটা থেকে কলেজ স্কোয়ারের একাংশ দেখা যায়।

একটু গরম হাওয়া বইছে। সারা দুপুর দরজা জানালা বন্ধ করেই রেখেছিল। বারোটার পর আর খোলা রাখা যায় না। লু বইতে থাকে। বিকেলে অবশ্য গরমটা একটু কমলেও হাওয়ায় গরম ভাবটা থাকে। অনিমেষের ইচ্ছে করে কলেজ স্কোয়ারে একটু বসতে। কিন্তু নির্দেশ আছে অনেক লোকের ভিড়ে যেন কখনও না থাকে।

আজ একটু গড়ের মাঠের দিকে যেতে হবে। সন্ধ্যের পর। তার আগে বেরোনো ঠিক নয়।

এ জীবনটা মন্দ নয়। সাজ বদলের খেলা। নতুন মুখোশ এঁটে এক চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রে মিলিয়ে যাওয়া। বেশ লাগলো তিন মাসের খেলাঘর। খেলা শেষ, ঘরও গেল ভেঙ্গে। এখন মনে হয় এ মিথ্যে খেলা সত্যি হলে যেন ভালো হতো। ছিন্নমূল কয়েকটা জীবন একসাথে কিছুদিনের জন্য একটা সংসার পেতে বসেছিল· স্বামী অনিমেষ, স্ত্রী হাসি দেবী, আর ওদের দুজনের একমাত্র ছেলে শুভ্রাংশু। পরিবার হিসাবে তুলনা হয় না। কত পার্থক্য তার নিজের ছেলে আর সাজানো ছেলের মধ্যে। নিজের ছেলেদের জন্য তাকে ঘর ছাড়তে হয়েছে। আর সাজানো ছেলের জন্য আবার ঘর বাঁধতে ইচ্ছে করছে। মিথ্যেটাই যেন সুখকর। অনেক বেশী তৃপ্তিদায়ক। তবু মিথ্যে মিথ্যেই।

সত্যিকারের জীবনটা মনে পড়ে·····

নৈহাটীর ভাটপাড়া অঞ্চল। ভালোয় মন্দয় মিশিয়ে মোটামুটি চার ছেলেই রোজগেরে। বড় ছেলের বিয়ের সময় অনেক দেখেশুনে সে এমন মেয়ে আনবে ঠিক করেছিল, যে সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকতে পারবে। বিয়ের পর দেখা গেল বড় বউই প্রথমে আলাদা হয়ে গেল। তারপরের দুই ছেলে নিজেরাই পছন্দ করে বিয়ে করে।

ছোট ছেলে যা রোজগার করে তার একটা বড় অংশ খরচ হয়ে যায় মদ্যপান, জুয়াখেলা এবং নারী-সঙ্গে। অনিমেষ কোন আপত্তি করেনি। যে যার নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতেই গড়ুক নিজেদের জীবন। কিন্তু একদিন এক চরম সত্য আবিষ্কার করলো অনিমেষ। সে যেন ও বাড়িতে নিতান্তই অপাংক্তেয়। এক অবাঞ্ছিত মানুষের মতো ব্যবহার শুরু করে ওরা।

দুই বউ আর দুই ছেলে ম্যাটিনী শো-এ সিনেমা দেখতে গেল। যাবার সময় বলে গেল—"বাবা, আপনি কোন হোটেল থেকে খেয়ে নেবেন।" হোটেলে যে বিনা পয়সায় খাওয়া যায় না এই সাধারণ জ্ঞানটুকুও বোধহয় ওদের ছিল না। সারাদিন না খেয়ে সে একটা রোজগারের পথ খুঁজেছিল। অন্ততঃ নিজের খরচটুকু চালাবার মতো কিছু টাকা। দূরসম্পর্কের এক ভাইপোর কাছে এসে উঠেছিল কলকাতায়। সেখানকার ব্যবহার দুর্বিষহ না হলেও প্রীতিপূর্ণ ছিল না। এই দুর্দিনের বাজারে কে আর উটকো ঝামেলা পোহাতে চায়?

কলকাতায় থাকতেই অনিমেষ ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়ে। কর্ম বিনিয়োগ অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে অনিমেষ দেখেছিল হাজার হাজার যুবক একটা ইন্টারভিউ পাবার জন্য পাগল। অনিমেষ আর চেষ্টা করেনি। এমপ্লয়মেণ্ট একস্‌চেঞ্জের দরজার পাশে হতাশায় বসে পড়ে। জলের ধারা নেমে আসে দু'চোখ দিয়ে। অর্থাৎ পৃথিবীতে তার বাঁচবার কোন অধিকার নেই। অথচ পরের মুখাপেক্ষী হয়ে সারাজীবন কাটানোও অসম্ভব। হঠাৎ একটা সহানুভূতিমাখা কণ্ঠস্বর শুনতে পায়—দাদু, আপনি কাঁদছেন কেন? তবু একজন অন্ততঃ জিজ্ঞাসা করেছে। দুঃখের কথা কাউকে বলতে পারলেও বুকের ভার খানিকটা লাঘব হয়। অনিমেষ সংক্ষেপে নিজের কথা বলে। লোকটি যেন ভগবানের আশীর্বাদের মতো এসেছিল। জিজ্ঞাসা করে—দাদু, আপনি একটা চাকরি করবেন? মোটামুটি একটা হাত খরচের টাকার সাথে খাওয়া থাকা।

চোখে জল নিয়ে অনিমেষ লোকটির হাত চেপে ধরেছিল। তার পরেই চাকরিতে বহাল হলো সে। অদৃশ্য এক জাদুকরের ইঙ্গিতে সম্মোহিতের মতো শুধু অভিনয় করে চলা। অভিনয় চলাকালীন বাবা হিসেবে স্বাভাবিক সংসারযাত্রা চালানোর জন্য মা হিসেবে অভিনেত্রীকে

স্ত্রীর মতো ব্যবহার করার অনুমতি ছিল। এতে অভিনেত্রীর কোন আপত্তি থাকবে না। কিন্তু হাসি দেবীর দিকে তাকিয়ে অনিমেষের সে ইচ্ছে হয়নি। উলটে মনে হয়েছে, বিড়ম্বিত ভাগ্য নিয়ে হাসি দেবীকে আজ খেলাঘরের মা সাজতে হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর মতো পাশাপাশি শুয়ে অনিমেষ হাসি দেবীর জীবন-ইতিহাস শুনেছিল। সব শুনে অনিমেষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল —আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আজকের অভিনয় তো আমাদের দুজনেরই চাকরি। অবশ্য আমি ছাড়া অন্য কেউ আপনার স্বামীর ভূমিকায় এলে···

কথা শেষ করতে না দিয়ে হাসি দেবী বলেছিল—আমি খবর নিয়েছি বাবা-মায়ের ভূমিকায় আমাকে আর আপনাকেই অভিনয় করে যেতে হবে। যতদিন না কেউ একজন এ চাকরি ছেড়ে দিই। তবে আপনার ভরসার জন্য আমি সারাজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

—আপনার কোন সন্তানাদি নেই? প্রশ্ন করে অনিমেষ।

হাসি দেবী হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। অনিমেষ বুঝতে পারে না অজান্তে সে কোনও আঘাত দিয়ে ফেলেছে কিনা। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে—আপনাকে কি আমি কোনও আঘাত দিয়ে ফেললাম?

—না না, আপনি আঘাত দেবেন কেন? আমাকে সব থেকে বড় আঘাত দিয়েছেন ভগবান। আমার কোন সন্তান থাকলে কি আর সম্পূর্ণ অজানা অপরিচিত আপনার পাশে এসে শুতে হতো? জানেন, ছোটবেলা থেকে ভাগ্যটা আমার খুব খারাপ ছিল না। বাবা-মায়ের স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছি। বিয়ের পর স্বামীর আদর-যত্নও পেয়েছি। কিন্তু কপালে সইলো না। বোধহয় গত জন্মের পাপ।

হাসি দেবীর কথা শুনতে শুনতে প্রায় অজান্তেই অনিমেষের একখানা হাত চলে যায় হাসি দেবীর মাথার ওপর। সান্ত্বনার সুরে বলে—দুঃখ পাবার কি আছে? কষ্টটাকে কখনও কষ্ট মনে করতে নেই।

গড়িয়ে পড়া চোখের জল মুছিয়ে দিতেই হাসি দেবী অনিমেষের হাতটা চেপে ধরে একটা অবলম্বনের মতো।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে হাসি দেবী নিজেই লজ্জা পেয়ে যায়। হাসি দেবীর মাথা অনিমেষের বুকে। ভোরের আলোয় অনিমেষের

ঘুমই আগে ভেঙেছে। স্নেহপূর্ণ আলতো করস্পর্শে হাসি দেবী যেন শিউরে ওঠে। হারিয়ে যাওয়া মানুষটার কথা মনে পড়ে। ছিঃ, বিধবার পরপুরুষের সান্নিধ্য···তাড়াতাড়ি চৌকি থেকে নেমে পড়ে। ক্ষীণ এক-টুকরো হাসির সাথে অনিমেষ চক্রবর্তী একটা সিগারেট ধরায়।

প্রবীণা স্ত্রীর মতোই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আবার ঘরে ঢোকে হাসি দেবী। ততক্ষণে অনিমেষ চক্রবর্তী প্রাতঃকৃত্য সেরে খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছে। চা-পান শেষ করে অনিমেষ রান্নাঘরের সামনে এসে হাঁক দেন—গিন্নি, শুনছো···বাজার থেকে কি কি আনতে হবে বলে দিয়ে যাও।

হাঁকডাকগুলো চলমান নাটকের অঙ্গ। তবু হাসি দেবীর মনের কোথায় যেন একটু খুশির ছোঁওয়া লাগে। থলে হাতে বেরিয়ে এসে দেখে অনিমেষ চক্রবর্তীর চোখে দুষ্টুমীর হাসি।

নতুন জায়গা। নতুন পরিবেশ। বাজার থেকে ফেরবার পথে দু' একজন সমবয়সী বৃদ্ধের সাথে আলাপ হয়। অনেকেই যেচে আলাপ করতে আসে। এর মধ্যে শুভ্রাংশু আসে দু' এক দিনের ছুটি কাটাতে। বাধ্য ছেলের মতো বাড়িতেই থাকে। দেখলেই মনে হয় বাবা-মায়ের আদুরে ছেলে।

শুভ্রাংশু রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করলে আশেপাশের জানালায় ভেসে ওঠে দু' চারটি কুমারী মুখ। বিবাহযোগ্যা মেয়েদের বাবারা বকুনি খায় মায়েদের কাছে। কেন এখনও নতুন ভাড়াটের সাথে আলাপ করে আসেনি। মেয়ের মায়েরা আসে হাসি দেবীর সাথে আলাপ করতে। পান খাওয়ার ফাঁকে জিজ্ঞাসা করে ছেলের বিয়ে দেবে কিনা। হাসি দেবী হেসে জবাব দেয়—পছন্দসই মেয়ে আর পাচ্ছি কোথায় দিদি ?

পরের দিন দুপুরবেলা মা আসে মেয়েকে নিয়ে। "মাসীমাকে প্রণাম কর" বলে মেয়ের সাথে হাসি দেবীর পরিচয় করিয়ে দেয়। মা আর মাসীমা কিছুক্ষণের মধ্যেই গল্পে মশগুল হয়ে গেলে মেয়েটি ঘুর ঘুর করতে থাকে। শুভ্রাংশু গায়ে জামা দেয়। সংযত গলায় মেয়েটির সাথে আলাপ করে। পাশের ঘরে অনিমেষ চক্রবর্তী দিবানিদ্রার ভাণ করে। এ সবই অভিনয়ের জন্য সাজানো জীবনযাত্রা।

দু' তিন দিনের বেশী থাকার নিয়ম নেই শুভ্রাংশুর। তাই তাকে

কলকাতায় ফিরে যেতে হয়। অনিমেষ আর হাসি দেবীর দাম্পত্য অভিনয় আবার চলতে থাকে। পাত্রীর মায়েদের অভিযানের পরেই বাবারা আসেন দাবি দাওয়ার পরিমাণ জরীপ করতে। দিনকালের অবস্থা থেকে আলোচনা রাজনৈতিক অবস্থার সমালোচনায় পাক খায়। তারপরেই মেয়েদের বিয়ের সমস্যা এবং ভাল পাত্র পেলে খরচ করার আশ্বাসের সঙ্গে শেষ হয় সেদিনের বৈকালিক আসর। অনিমেষ সবার কথাই শোনে কিন্তু নিজের মত ব্যক্ত করে না। নিলামে ছেলের দর বাড়তে থাকে।

কয়েকদিনের মধ্যেই হাজির হয় সুধীর হালদার। সব খবর নিয়ে সে ফিরে আসে কলকাতায়। সব কিছু বিচার করে নির্দেশ আসে কলকাতা থেকে। জানকীনাথ মিত্র এ খেলায় জয়ী হয়। তারপরেও নাটক। শুভ্রাংশু এসে সব শুনে কেমন যেন বেঁকে বসে। পণ নিয়ে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। জানকীবাবু নিজে এসে বোঝান—বীথি আমার একমাত্র মেয়ে, তুমি বরপণ বলে যাকে মনে করছো সেটা আসলে মেয়েকেই স্নেহের দান দেওয়া। তোমরা নতুন সংসার পাতবে, তোমাদের জীবন যাতে সুখের হয় সেটা দেখাও তো আমাদের কর্তব্য। শুধু ওর মায়ের অনুরোধটুকু আমায় রাখতে দাও। তোমরা তো চাইছ না। আমি ইচ্ছে করেই দিচ্ছি। তুমি আর আপত্তি কোরো না।

অনিমেষ চক্রবর্তীর কানে আসতো কথাগুলো। বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হতেন, কিন্তু কিছু করার নেই। দারুণ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে যাকে শুধু প্রাণধারণের কথা ভাবতে গিয়ে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের দরজায় বসে চোখের জল ফেলতে হয়েছিল, তার কাছে আর যাই হোক, বিবেক প্রাধান্য পেতে পারে না। কন্যাদায়গ্রস্ত বাবাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঠকানো যতই ঘৃণ্য মনে হোক না কেন, এটাই যে তার অন্নসংস্থানের পথ, সেই কথা ভেবেই অনিমেষ নিজেকে সান্ত্বনা দেয়।

এক এক সময় ভেতরের মানুষটা বিদ্রোহ করে ওঠে। একটা সুচিন্তিত প্রতারণার আসর। ভগবানের কাছে দোষী হওয়ার চেয়েও নিজের কাছেই নিজেকে বেশী অপরাধী মনে হয়। পরক্ষণেই ভাবে, অনিমেষ ছেড়ে দিতে চাইলেও ওরা অনিমেষকে ছাড়বে না। তা ছাড়া অনিমেষের বদলে আসবে অন্য কেউ, আবার চলবে অভিনয় এবং প্রতারণা।

অপরাধ চলতেই থাকবে যতক্ষণ না একটা শেষ বিন্দুতে এসে পৌঁছায়; তাহলে অনিমেষই বা কেন এ কাজ ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে পথে ঘুরবে ?

নিজের সাথে যখন নিজের এই সব টানাপোড়েন চলে তখন একখানা হাতের স্পর্শ পায় কাঁধে। প্রশ্ন আসে—কি ভাবছো গো ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে অনিমেষ বলে—তুমি ভগবান বিশ্বাস করো হাসি ?

—করি। সর্বান্তঃকরণে করি।

—তাহলে এতবড় অন্যায়ে সহযোগিতা করছো কি করে ?

এক করুণ বিষাদ হাসি দেবীর মুখখানা ম্লান করে দেয়। ব্যথাভরা গলায় বলে—তুমি আমি আর কি করতে পারি বলো ? আমি তো রাত দিন ঠাকুরকে বলি, অনেক অন্যায় আমরা করছি, তুমি শুধু আমাদের কথা চিন্তা করে আমাদের রক্ষা কর ঠাকুর।

আঁচলে চোখের জল মুছে অনিমেষের বুকে হাত দিয়ে হাসি দেবী আবার বলে—তুমিও বোধহয় এই সব ভাবো ? আর ভেবো না। সবই ভগবানের বিধান। তবু এর মধ্যে আমার মস্ত সুখ।

—কি সুখ ? অনিমেষের চোখে ভাবমিশ্রিত জিজ্ঞাসা।

—খেলাঘরে তোমার মতো মানুষের সংস্পর্শে আসা। ভগবানকে তাই আমি শতকোটি প্রণাম জানাই। স্বামী হারিয়ে যাকে পেলাম সেও স্বামীর চেয়ে কম নয়। তাইত বলি, ঠাকুর, তুমি আমার এ খেলাঘর ভেঙে দিও না।

ঘষা কাচের মতো ঝাপসা চাহনিতে অনিমেষ তাকায় হাসির দিকে। হাসিকে টেনে আনে বুকে। আবেগে হাসির পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলে—হাসি, যদি আমরা কখনো এই ব্যূহ থেকে বেরোতে পারি, কথা দাও তুমি আমার সাথে থাকবে। আমরা এই খেলাঘর ছেড়ে খোলার ঘরে এক নতুন জীবন শুরু করবো। অতীতের সব কান্না ভুলে গিয়ে আমরা আবার হাসবো। বলো তুমি থাকবে আমার সাথে ?

—তোমার কাছে থাকার অধিকার পেলে আমি মরতেও ভয় পাই না গো। খোলা চুল এলিয়ে পড়ে অনিমেষের বুকে। কেউ জানলো না পৃথিবীর এক কোণে দুটি ছিন্নমূল প্রায় বৃদ্ধ নরনারী এক মিলিত জীবনের অদৃশ্য চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলো।

॥ দশ ॥

—হ্যাল্লো তপন, কতক্ষণ এসেছো? বলতে বলতে ঘরে ঢোকেন মিঃ বোহরা।

—এই কিছুক্ষণ।

—তোমার বাড়ি যেতে দু' একদিন দেরি হতে পারে। মানে পরিস্থিতি অনুযায়ী এগোতে হচ্ছে বলেই বলছি। অবশ্য যে ক'দিন তুমি কলকাতায় থাকবে তোমার সব রকম এণ্টারটেইনমেণ্টের ব্যবস্থা করা হবে। আই মীন, তুমি এ ক'টা দিন গেস্ট হাউসেই কাটাবে। আশা করি নতুন পাখির সাথে এক খাঁচায় থাকতে তোমার খারাপ লাগবে না।

—ঠিক আছে কাজের কথা বলুন। তপন সোজা ভাবে বলে।

—শেলী ট্যাণ্ডনের তোমার ওপর একটু দুর্বলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ওদের নাটকে তুমি অংশগ্রহণ করবে না, কিন্তু রিহার্সালে এসে শেলীকে এনকারেজ করবে। সেই সাথে আমি মিঃ ট্যাণ্ডনকে একটু স্টাডি করতে চাই। এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে মিঃ বোহরা তপনের মুখের দিকে তাকায়।

—এখানে আমার ভূমিকা কি হবে?

—আসল কথা হলো শেলীর অনুরোধে তুমি আসবে কিন্তু ফাঁসবে না। কাছে যাবে কিন্তু ধরা দেবে না। শেলীকে চার হিসেবে ব্যবহার করে আমি মিঃ ট্যাণ্ডনের মতো রুই মাছকে ডাঙ্গায় তুলতে চাই।

—এটা কতদিন চলবে?

—দিন কুড়ি থেকে এক মাস। তারপর নতুন প্রোগ্রাম তৈরি করা হবে।

তপন চুপ করে মিঃ বোহরার কথা শোনে। মুখে কিছু বলে না। এমন সময় মিসেস বোহরা ঢোকেন। পেছনে পরিচারিকার হাতে ট্রেতে ধূমায়িত কফির পেয়ালা।

ওরা কফির পেয়ালায় চুমুক দেয়। ইতিমধ্যে পোর্টিকোতে গাড়ি ঢোকবার আওয়াজ সবাইকে সচকিত করে দেয়। মিঃ বোহরা হঠাৎ নাটকের প্রসঙ্গে কথা বলতে থাকেন—বুঝলে তপন, এ নাটকটা সাকসেস-ফুল হলে সি. সি.এ কলকাতায় অন্যতম কালচারাল এসোসিয়েশন হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। অবশ্য তার জন্য কাগজে কিছু পাবলিসিটি চাই।

খোলা দরজার সামনে শ্লক্স্ পরিহিতা শেলীকে দেখা যায়। অভ্যর্থনা জানায় সীমা।—এসো শেলী এসো। এতক্ষণ তোমাদের নাটকের কথাই হচ্ছিল।

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শেলীর মুখ। আঙ্কল আন্টির গালে মৃদু চুমু খেয়ে তপনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে বলে—গুড্ ইভনিং মিঃ দাশগুপ্ত। আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় আসতেই পারবেন না। যা ব্যস্ত লোক!

—ঠিক বলেছো। ওর ওই ব্যস্ততা আমারও ভালো লাগছে না। তাই ভাবছি ওকে আমার কোম্পানিতেই নিয়ে নেবো। অবশ্য ওকে আপাততঃ আউটস্টেশন জব করতে হবে। দেখাশোনার অভাবে বাইরের পার্টি-গুলো প্রায় হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।—কথাগুলো বলেন মিঃ বোহরা।

শেলী অভিমানী সুরে বলে—ওঃ আঙ্কল, এই জন্যই আপনাদের আমার ভালো লাগে না। আপনি, ড্যাডি দেখা হলেই শুধু ব্যবসার কথা।

—স্যরি শেলী। হ্যাঁ তপন, আমরা নাটকের কথাই বলবো। আমরা 'ওথেলো' নাটক করছি। ডেসডিমোনার ভূমিকায় থাকছে শেলী। এখন একজন ভালো ওথেলো দরকার।

—মিঃ দাশগুপ্তকে বলুন না আঙ্কল!

—ওরে বাবা, আমি জীবনে কোনদিন স্টেজে উঠিনি। লোকে ইঁট পাটকেল ছুঁড়বে। একবার মামাবাড়িতে অভিনয় করতে গিয়ে আমার প্রথম সিনেই গোঁফ খুলে গেল। তারপর সারা সিন গোঁফ চেপে ধরে অভিনয় করলাম। দর্শকদের সে কি হাসি! ওরে বাবা, আর স্টেজে উঠি!

তপনের বলার ভঙ্গিতে সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

শেলী হাসতে হাসতে বলে—ওথেলোর গোঁফ থাকবে না। আপনি অনায়াসে অভিনয় করতে পারেন।

—প্লিজ মিস ট্যাণ্ডন, আমাকে আর বিপদে ফেলবেন না। তপন হাতজোড় করে।

হঠাৎ সীমা দরজার দিকে তাকিয়ে বলে—অন্য সবাই এসে গেছে। আমি রিহার্সাল রুমে যাচ্ছি। তোমরা এসো। সীমার পেছন পেছন মিঃ

বোহরাও এগিয়ে যান। যাবার আগে বলেন—তুমি একটু রেস্ট নিয়ে এসো শেলী। আমি এগোচ্ছি।

মিঃ বোহরা বেরিয়ে যেতেই তপন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে। শেলীর কিন্তু চাহনি বেশ সপ্রতিভ। মৃদুস্বরে বলে—আপনি ওথেলো করলে আমি দারুণ ইন্সপিরেশন পেতাম।

—বিশ্বাস করুন, অ্যাক্টিং আমার একদম আসে না।

—তাহলে চলুন আমাদের প্রথম দিনের রিহার্সালে আপনাকে থাকতেই হবে।

অগত্যা তপনকে উঠতে হয়। ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে টানা বারান্দা। শেলী আর তপন পাশাপাশি চলছে। মাঝে মাঝে ওদের ছোঁওয়াছুঁয়ি হয়ে যাচ্ছে। তপন যেন বুঝেও বুঝতে পারছে না। ওর মনে হয় শেলী একটা নিষ্কলুষ ফুল। বৃন্তের ওপর ও আপনমনে হাসছে দুলছে। অথচ ওকে ছোঁয়ার কোন অধিকার নেই তপনের।

—যতক্ষণ রিহার্সাল চলবে আপনি থাকবেন তো?

—কতক্ষণ চলবে?

—প্রথমদিন তো, ঘণ্টা দুয়েক।

—অতক্ষণ তো থাকতে পারবো না!

—অন্য কোন এপয়েণ্টমেণ্ট আছে বুঝি?

—না না তা নয়। অতক্ষণ চুপচাপ এক জায়গায় বসে থাকাই আমার পক্ষে মুশকিল।

—কিচ্ছু হবে না। আমি নিজে ড্রাইভ করে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

তপন তাকায় শেলীর দিকে। শেলীর চোখে সুন্দর লাজুক চাহনি।

ওরা রিহার্সাল রুমে ঢোকে। মিঃ ফিলিপ নামে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক নাটকের পরিচালক। শেলীকে দেখেই মিঃ ফিলিপ উৎসাহে বলে ওঠে—ওই তো ডেসডিমোনা এসে গেছে। সঙ্গে কি ওথেলো?

শেলীর চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়—উনি মিঃ দাশগুপ্ত। ইনি মিঃ ফিলিপ। শেলী পরিচয় করিয়ে দেয়।

রিহার্সাল চলতে থাকে। প্রথম দিন বলেই বোধ হয় ঘণ্টা দেড়েকের

মধ্যে শেষ হয়ে গেল। খুশীতে উচ্ছল শেলী তপনকে জিজ্ঞাসা করে—কেমন হবে আমাদের নাটক ?

—নাটকের বিশেষ কিছু বুঝি না। তবে এটুকু বলতে পারি ডেসডিমোনা হিসেবে আপনার তুলনা হয় না।

—ফ্ল্যাটারী করছেন ?

—আমি ফ্ল্যাটারী করি না। দেখে যেটুকু মনে হলো তাই বললাম।

শেলী নীরব। ওরা পায়ে পায়ে মিঃ বোহরার ড্রয়িং রুমের দিকে এগোতে থাকে।

ফাঁকা ড্রয়িং রুম। কেউ কোথাও নেই। মিঃ এবং মিসেস বোহরা তখনও রিহার্সাল রুমে। তপন কোন কথা বলছে না। শেলী ভাবছে ও কিছু বলুক। অনেক কথা বলতে ইচ্ছা করছে শেলীর। কিন্তু অপর পক্ষ অত নিস্পৃহ হলে কিছু বলা যায় না। কেন এই নিস্পৃহতা ? তবে কি তপনের···

—মিঃ দাশগুপ্ত, আপনার কি কোন মেয়ে বন্ধু আছে ?

চমকে ওঠে তপন। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—কেন বলুন তো ?

—আপনাকে দেখলে মনে হয় কি যেন ভাবেন সব সময়।

হো হো করে হেসে ওঠে তপন। শেলীর টানা টানা চোখে অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টি। তপন মৃদু স্বরে বলে—আসলে আমার পেশাগত ভাবনাই এত বেশী যে অন্য কিছু ভাববার সময়ই পাই না। আর বান্ধবী ? যার বন্ধুই নেই, তার আর বান্ধবী জুটবে কোথেকে ?

শেলীর বিস্ফারিত চোখ আবার স্বাভাবিকতায় ফিরে আসে। একটু যেন নিশ্চিন্ত বোধ করে। তপনের কাছে এ এক অস্বস্তিকর মুহূর্ত। দুর্বলতার পদধ্বনি শোনে মনের গভীরে। প্রতীক্ষা করে কতক্ষণে মিঃ এবং মিসেস বোহরা আসবেন। কিন্তু তার বদলে ঘরে ঢোকেন মিঃ ট্যাণ্ডন।

নির্জন ঘরে ওদের দুজনকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ান। তারপরেই কাছে এগিয়ে এসে বলেন—হাই শেলী, তোমাদের মহড়া শেষ হয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ ড্যাডি। আঙ্কল আর আণ্টি এক্ষুনি এসে পড়বেন। তুমি বস।

—হ্যালো ইয়ংম্যান। তুমিও নিশ্চই শেলীদের নাটকের একজন শিল্পী?

—না বাবা। উনি মিঃ তপন দাশগুপ্ত। সি. সি. এ.-র মেম্বার; তবে নাটকে নেই।

—কেন? এত হ্যাণ্ডসাম দেখতে অথচ অভিনয় করছো না……মিঃ ট্যাণ্ডনের হাসি হাসি মুখে দৃষ্টিটা যেন একটু কঠিন হয়ে ওঠে।

তপন সে দৃষ্টির দিকে একবার তাকিয়ে জবাব দেয়।—নাটকে আমি অভিনয়ের চেয়ে দর্শকের ভূমিকায় থাকতে বেশী পছন্দ করি। কেননা তাতে পার্ট ভুলে যাওয়া বা গোঁফ খুলে যাবার ভয় থাকে না।

মিঃ ট্যাণ্ডন তপনের সপ্রতিভ উত্তর শুনে হেসে ওঠেন।

—"হ্যাল্লো মিঃ ট্যাণ্ডন" সবাই দরজার দিকে তাকায়। সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ এবং মিসেস বোহরা। আনন্দে উল্লাসিত মুখে মিঃ বোহরা ঘরে ঢোকেন। মিসেস বোহরা কফির আয়োজন করতে ভেতরে চলে যান।

—রিহার্সাল হলো? মিঃ ট্যাণ্ডনের জিজ্ঞাসা।

—প্রথম দিনের রিহার্সাল দেখে তো হোপফুল মনে হচ্ছে। দেখা যাক্। ভাল কথা এর সাথে আপনার আলাপ হয়েছে? তপনের দিকে তাকিয়ে মিঃ বোহরা জিজ্ঞাসা করেন।

—হ্যাঁ। ভেরী নাইস ইয়ংগার! তবে স্টেজে ওঠার ব্যাপারে খুব লাজুক।

তপন হেসে মিঃ ট্যাণ্ডনের কথা সমর্থন করে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে—এবার আমাকে উঠতে হবে। চলি মিঃ বোহরা। চলি মিঃ ট্যাণ্ডন।

—চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। শেলী তপনের উদ্দেশ্যে বলে।—ড্যাডি, আমি এঁকে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাবো।

মিঃ ট্যাণ্ডন হেসে সম্মতি জানান। সবার অলক্ষ্যে তপন আর মিঃ বোহরার সাথে একবার চোখাচোখি হয়ে যায়।

শেলী আর তপন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। তপন নীরবে শেলীর পাশে পাশে হেঁটে পোর্টিকোতে পৌঁছে যায়। শেলী গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভারের সীটে বসে, পাশের দরজাটা খুলে তপনকে অভ্যর্থনা জানায়। তপন উঠে ওর পাশে বসে।

গাড়ি বিবেকানন্দ রোড ধরে হাওড়ার দিকে চলতে থাকে। তপন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শেলীর দিকে তাকাতেই শেলী বলে—ভয় নেই, আপনাকে কিডন্যাপ করবো না। কলেজ স্ট্রীট এখন ভীষণ জ্যাম। তাই চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে এসপ্ল্যানেড যাবো। আপনার কি তাড়া আছে?

—না তেমন কোন তাড়া নেই। তপন আমতা আমতা করতে থাকে।

শেলী গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে তাকিয়ে আছে সামনে। মাঝে মাঝে আড়চোখে তপনকে দেখছে। তপন বোঝে কিন্তু সোজাসুজি শেলীর দিকে তাকাতে পারে না। এক অস্বস্তিকর পরিবেশ। শেলীর কথাবার্তায় আকারে ইঙ্গিতে স্পষ্ট অভিব্যক্তি আর তপনের প্রাণপণে নিজেকে লুকিয়ে রাখার প্রয়াস। সত্যকে মিথ্যার আবরণে ঢেকে রেখেই তপনকে বাঁচতে হবে। তারপর?…আর ভাবতে পারে না তপন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

গাড়ি চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে বাঁক নেয়। তপন অনেক কষ্টে একবার শেলীর দিকে তাকায়। এবারে শেলীকে যেন কিঞ্চিৎ গম্ভীর মনে হয়। গাড়ি আস্তে আস্তে চলতে থাকে। সামনে চোখ রেখেই শেলী বলে উঠে—আমার মনে হচ্ছে মিঃ দাশগুপ্ত, আপনি কি এক মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন। মনে হচ্ছে কি একটা কাজ যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধেও আপনাকে করতে হচ্ছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে আপনি দুটো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন। কি সমস্যা আপনার? আশা করি আমাকে বন্ধু হিসেবে নিতে আপনার আপত্তি নেই। সুতরাং সেই পরিমাণে বিশ্বাসও করতে পারেন আমাকে। এবার বলুন আপনার সমস্যা। ধরুন বন্ধু হিসেবে এটা আমার দাবি।

শেলীর কথা শুনে শিউরে ওঠে তপন। শেলী ওকে অনেকখানি বুঝে ফেলেছে। অথচ এই মুহূর্তে কিছু একটা না বললে শেলীর কৌতূহল এবং অনুসন্ধিৎসা আরও বেড়ে যাবে।

—আপনি ঠিকই ধরেছেন মিস ট্যাণ্ডন। আমি এক মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। কলকাতার বাইরে এক মফস্বল শহরে আমার বাবা একটি ছোট ভাইকে নিয়ে থাকেন। আজ কিছুদিন ধরে আমার ছোট ভাই অসুস্থ। এদিকে ব্যবসা থেকে আমার যা আয়, নিজের খরচের পর খুব বেশী টাকা বাবাকে পাঠাতে পারি না। এই সব নানা কারণে মনটা

একটু বিধ্বস্ত। আপনার সাথে হাসিমুখে কথা বলতে পারছি না বলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আর একটা কথা, আমার দুঃখ আমাকেই বইতে দিন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আমাকে ছোট করবেন না আশা করি। সেই সাথে এসব কথা আর কাউকে বলবেন না। অন্যের সহানুভূতির কথা আমি সহ্য করতে পারি না।

শেলী স্তব্ধ হয়ে তপনের কথা শুনছিল। গাড়ি এসপ্ল্যানেডের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তপন মনে মনে ভাবে কোনরকমে গাড়ি থেকে নেমে পড়তে পারলে বাঁচা যেতো।

—ময়দানে একটু বসবেন মিঃ দাশগুপ্ত ?

—মাফ করবেন মিস ট্যাণ্ডন। এক পার্টির সাথে আমাকে দেখা করতে হবে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে তবু একটু ভুলে থাকতে পারবো। নির্জন খোলা জায়গায় বসলে হয়ত অনেক দুঃখের কথা বলে আপনার সুন্দর সন্ধ্যাটাই নষ্ট করে দেবো।

—আমি যদি আপনার দুঃখের কথা শুনতে চাই ?

—আমার পক্ষে শোনানো সম্ভব নয়।

গাড়ি থামে। তপন শুভরাত্রি জানিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। কোন দিকে না তাকিয়ে হনহন করে চলতে থাকে। উদ্দেশ্যহীন হাঁটা। কোনরকমে শেলীর দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে হবে। আলোগুলোকে অসহ্য মনে হচ্ছে। নিজেকে অন্ধকারে মিশিয়ে দিতে পারলে ভাল হতো। এক ঝলক পেছনে তাকিয়ে দেখে শেলীর গাড়িখানা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় পা ফেলে তপন এগিয়ে চলে রাস্তার দিকে। দূর থেকে অন্য একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো এসে মুখে পড়ে। তপন দু'হাতে মুখ ঢাকে। জীবনে একটুখানি আলোর সন্ধানেই তো ঘুরেছে। আজ আলোকেই অসহ্য মনে হচ্ছে। অন্ধকার চাই। অন্ধকারের আশ্রয়েই তাকে বাঁচতে হবে। রাস্তার প্রতিটি আলোর বিন্দুতে মনে হয় শেলীর মুখ। তপন বড় বড় পদক্ষেপে চলতে থাকে আর ভাবে, শেলী তুমি সরে যাও, তোমার হাসি মুখ আমি সহ্য করতে পারছি না। অনেক লোকের ভিড়ে কে যেন তপনের নাম ধরে ডাকে। হোঁচট খায় তপন। পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নেয়। ইউ. এস. আই. এস.-এর দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। দু' একজন পথচলতি লোক ওর মুখের দিকে তাকায়। তপন মুখ ফিরিয়ে নেয়।

॥ এগার ॥

সকাল থেকেই মনটা কেমন খারাপ লাগে পিউর। কিছু করতে ইচ্ছে করে না আবার চুপচাপ বসে থাকতেও খারাপ লাগে। অথচ মন খারাপ হওয়ার নির্দিষ্ট কোন কারণও খুঁজে পায় না। 'স্বরলিপি' বইখানার মলাটের ওপর লেখা পিয়ালী ঘোষ। নিজের নামটার দিকে নিজেই অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। অনিমাকে আজ একটা নতুন গান তুলে দেবার কথা আছে।

চুপচাপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা অনিমাদের বাড়িতে চলে আসে। প্রথম স্তবক তুলে দিয়ে পিউ বসেছিল। অনিমা ভুল সুরে হারমোনিয়াম বাজায়। কিন্তু পিউ অন্যমনস্ক।

—আজ থাক দিদি। মনে হচ্ছে আপনার শরীরটা ভালো নেই।

একটু যেন লজ্জা পায় পিউ। তাড়াতাড়ি বলে—না না, তুমি গাও, আমি শুনছি।

—আজ আমার গাইতে ইচ্ছে করছে না। বরং আপনি গান করুন আমি শুনি।

পিউ মনে মনে বলে, সেই ভালো। আজ সে গাইবে। তবু যদি মনের মেঘলা ভাবটা কেটে যায়। আস্তে আস্তে গাইতে থাকে—তোমায় গান শোনাবো, ওগো দুঃখ জাগানিয়া…

পর পর কয়েকখানা গান গেয়ে পিউ বেরিয়ে আসে। নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হয়। গান গেয়ে জমে থাকা মনের মেঘটা অনেকটা কেটে গেছে ঠিকই। কিন্তু একটা দুশ্চিন্তার কাঁটা যেন তখনও খচখচ করছে। আনমনে পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। কে শান্তনু না? হ্যাঁ তাই তো। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে। এখন আর কোন ক্লান্তি নেই। কাছাকাছি যেতেই নিজের ভুল বুঝতে পারে।

এতক্ষণে যেন মন খারাপের কারণটা বুঝতে পারে। ভাগ্যিস ভদ্রলোক বুঝতে পারেননি। মেয়েদের অনেক সাধারণ ভুলেরও মাশুল দিতে হয়। এই তো কিছুদিন আগে সংঘমিত্রাকে গান শেখাতে যেতে পারবে না খবরটা দেবার জন্য একটা টেলিফোন করবে ভেবেছিল। ঠিক সেই সময় সংঘমিত্রার দাদাকে দেখতে পায়। "রঞ্জনবাবু" বলে চেঁচিয়ে ডাকতেই

ভদ্রলোক পেছন ফিরে চায়। পিউকে ওভাবে চেয়ে থাকতে দেখে সোজা এসে বলেছিল—আমাকে কিছু বলছিলেন ?

—না। মাফ করবেন, আপনাকে আমি অন্য একজনের সাথে গুলিয়ে ফেলেছিলাম।

তারপরেই ভদ্রলোক কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রেট কত ?

লজ্জায় পিউর মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। কোনরকমে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচে। পরে জেনেছিল বাবু-ধরা মেয়েদের ভুল নামে ডাকাটাই নাকি সত্যিকারের ডাকা। অবশ্য শান্তকে কোনদিন ডাকতে হয়নি। পিউ পেছনে থাকলেও শান্ত যেন বুঝতে পারতো। অন্যমনস্ক হলেও একবার পেছনে তাকাবে আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক হাসি। কাছে এসে পিউ জিজ্ঞাসা করেছে—তুমি জানলে কি করে আমি পেছনে আছি ?

—মনের টানে। বুঝলে খুকুমণি ?

ওটা ওর আদরের ডাক। এমনিতে পিউ বলে ডাকে। হঠাৎ শান্তর ওপর দারুণ রাগ হয় পিউর। ছ'মাসের ওপর হয়ে গেল, কোন খবর নেই। মাঝে মাঝে মণি অর্ডারে টাকা পাঠায়। তা থেকে বোঝা যায় মানুষটা বেঁচে আছে। ফর্মের তলায় গোটা গোটা করে লেখা—টাকাটা রেখে দিও। ঠিকানার ঠিক নেই। সময় পেলে সশরীরে আসবো। ইতি কোন নাম নেই। তা না থাকুক ওই লেখা পিউর অনেক দিনের চেনা। কিন্তু কি এমন কাজ···সামনাসামনি পেলে বেশ খানিকটা ঝগড়া করতে হবে।

ওয়াক্ থুঃ···সশব্দে থুথু ফেলায় পিউ চমকে তাকায়। উগ্র প্রসাধনে কেমন যেন অস্বাভাবিক দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি তরুণী। একটু নীচু শ্রেণীর। প্রসাধনে যেন ওকে আরও কুৎসিত লাগছে। দৃষ্টিটা চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। ও ওরাই তাহলে···দেখা উচিত নয়। তবু কয়েক সেকেণ্ড না তাকিয়ে পারে না। একটি লোক এগিয়ে যাচ্ছে ওর দিকে। আর নয়। এবার তাহলে পিউর দিকেও কেউ এগিয়ে আসবে।

পিউ তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে। শিয়ালদা হকার্স কর্ণারকে বাঁয়ে রেখে দু'পা এগোতেই ক্যাঁচ্ করে একটা ট্যাক্সি ওর সামনে ব্রেক করে দাঁড়ায়।

একটা শিহরন খেলে যায় পিউর সারা শরীরে। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে বলে—একটু দেখে শুনে চলুন দিদি! চাপা পড়লে তো শালা ড্রাইভারের দোষ। পেছনে বসা দুজন যুবকযাত্রী বিশ্রীভাবে হেসে ওঠে। ট্যাক্সি ভাড়া করেছে সুতরাং টিটকিরি দিয়ে হাসার অধিকার ওদের আছে।

—পিয়ালী শোন।

চমকে পেছনে তাকায় পিউ। না ভয়ের কিছু নেই। পরেশদা ওদের পাড়ায় থাকে। হকার্স কর্ণারে কাপড়ের দোকানের মালিক।

—এত অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছো কেন? এসো আমার দোকানে একটু বসো। একটু চা খেয়ে তারপর বাড়ি যেও।

চাপা পড়ার আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা কাঁপছে। পিউ পরেশদাকে অনুসরণ করে। সরু সরু গলি। দুজনে পাশাপাশি হাঁটা যায় না। পাশ কাটাতে ধাক্কা লেগে গেল একটি মেয়ের সাথে। চোখ তুলে তাকাতেই দেখে তুলিকা। পিউর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো। স্কুল ছাড়ার সাথে সাথে ওদের মধ্যেও ছাড়াছাড়ি। তুলিকা হেসে বলে—পিয়ালী না?

—চিনতে পেরেছিস? বাব্বাঃ, কতদিন পর দেখা বল তো?

তুলিকার সিঁথিতে লাল সিঁদুরের রেখা। বড্ড জ্বলজ্বল করছে। পেছনে দাঁড়ানো ধুতি পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে তুলি বলে —এ হচ্ছে পিয়ালী। আমরা একসাথে স্কুলে পড়তাম।

নমস্কার বিনিময়ের পর তুলি বলে—হ্যাঁরে, তোরা কি বেলেঘাটার সেই বাড়িতেই আছিস?

—হ্যাঁ। কোথায় আর যাবো বল?

—মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছিস তখন কোথাও না কোথাও তো যেতেই হবে। যাক্ গে, মাসীমা কেমন আছেন?

—ভালো।

—তুই কি করছিস রে এখন? পড়ছিস?

—না। গান শিখি আর শেখাই।

—এই, তুমি অপুর জন্য একজন গানের মাস্টার খুঁজছিলে না? স্বামীর উত্তরের অপেক্ষা না করেই তুলি বলে,—এই তুই আমার ননদকে গান শেখাবি? বছর পনেরো বয়স। পড়াশুনার চেয়ে গানের দিকে ঝোঁক বেশী।

—তোর শ্বশুরবাড়ি কোথায় ?

—এই তো শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে একটু এগিয়ে। শোন, আমি একদিন তোদের বাড়ি গিয়ে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবো। আজ চলি রে।

তুলিকা ঝুমকো দুলিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতেই ওর স্বামী বললো—একদিন আসবেন। অনেক গল্প করা যাবে। চলি।

এর মধ্যে তুলিকা কয়েক পা এগিয়ে গেছে। ভদ্রলোক তুলিকার দিকে তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে।

এই সেই তুলিকা। মাসের অর্ধেক দিন যে পড়া পারতো না। সব সময় কেমন যেন একটা অপরাধী অপরাধী মুখ। অথচ আজ ? এক প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারে অনায়াসে ননদকে গান শেখাবার প্রস্তাব করে গেল। একটা সিঁদুরের রেখায় আজ ও অহঙ্কারী। চোখ মুখ ওপচানো সুখী সুখী ভাব! ব্লাউজের হাতা চেপে বসে গেছে। তুলিকার স্বাস্থ্যটা আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে।

—কি গো খাবে না ? তোমার জন্য চা আনতে পাঠিয়েছি।

পরেশদার কথায় সংবিত ফিরে পায় পিউ। বুকের ধড়ফড়ানি ভাবটা এখন কমে গেছে।

—ছাত্রীর বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি। এখন আর খাবো না। চলি পরেশদা।

বাস স্টপেজের দিকে এগোতে থাকে পিউ। রিনরিন করে আবার একটা মুখ ভেসে ওঠে মনের গভীরে। নিজের মনেই পিউ বলে—শান্ত, কেন এভাবে আমাকে শাস্তি দিচ্ছ ? তুলিকার এতো অহঙ্কার কেন জান ? আমার সিঁথিটা সাদা দেখে। অথচ একমাত্র তুমিই পার····· আর পারছি না······বিশ্বাস করো, এভাবে বেশীদিন থাকতে হলে আমি ঠিক মরে যাবো।

পিউ বাস স্টপেজে এসে দাঁড়ায়। অপেক্ষমান প্রতিটি লোক একবার করে পিউর দিকে তাকাচ্ছে। পিউ মোটেই সুন্দরী নয়। তবু লোকগুলো পিউকে দেখবে। কথাটা শান্তকে বলায় ও বলেছিল—তাতে কি হয়েছে! মেয়েরা তো দেখবারই জিনিস! আমরা তোমাদের দেখি বলেই তো তোমরা সুন্দর। তোমাদের অহঙ্কার। অবশ্য সুন্দর ছেলেদের

দিকেও মেয়েরা তাকায়, তবে লুকিয়ে চুরিয়ে। সেখানেও এক প্রচ্ছন্ন গর্ব তোমাদের ভেতরে কাজ করে। চুরি করে দেখবে অথচ যাকে দেখবে তাকে জানতে দেবে না। তোমাদের এই চোরা চাহনির নীরব ভাষা আমরা উপভোগ করি। পিঠে এক চাপড় মেরে পিউ বলেছিল—মেয়েদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছো মনে হচ্ছে? ক'জনের সাথে প্রেম চালাচ্ছো বলো তো?

—ও বাবা, একজনকেই সামলাতে পারছি না। বেকার ছেলের কি বেশী প্রেম চালানো সম্ভব?

—তুমি নিজে সুন্দর বলে খুব গর্ব না?

—তা একটু আছে। হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল শান্ত।

ওর ওই সর্বনাশা হাসিটাই কাল হয়েছে। কিছুতেই রাগ করে থাকা যায় না। বড় সুন্দর, বড় পবিত্র।

পরের বাসটা এসে দাঁড়ায়। আর অপেক্ষা করা যায় না। দরজার কাছে অনেক মেয়ে পুরুষের ভিড়। হুড়োহুড়ি করে পিউও বাসে ওঠে। কোনরকমে এক চিলতে জায়গা পেয়ে বসে। বাস চলতে শুরু করে।

আজ যেন খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল জোড়া মন্দির। চোখ তুলে তাকায় জোড়া মন্দিরের দিকে। এ ওর গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শ্লথ পায়ে পাশের গলিতে ঢোকে পিউ। জীবজগতে সবই জোড়া জোড়া। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রায়ই দেখে এক জোড়া কাক বসে থাকে ওদের বাথরুমের চালে। অলস নিস্তব্ধ দুপুরে পিউ লক্ষ্য করেছে, ওরা একে অন্যকে আদর করছে। পিউর সারা শরীরে কিসের যেন এক স্রোত বয়ে যায়। চকিতে এক সন্ধ্যার ঘটনা মনে পড়ে।

রাসবিহারী এভিনিউর মোড় থেকে একটু এগিয়ে শান্তর এক বৌদির বাড়ি। শান্তর সঙ্গে ওর বৌদির খুব মিষ্টি সম্পর্ক। পিউর কথা শুনে একদিন দেখতে চেয়েছিলেন। ওরা গিয়েছিল। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পিউকে দেখে দারুণ পছন্দ হয়েছিল বৌদির। দাদার ফিরতে রাত আটটা সাড়ে আটটা। শান্তর নাক টিপে বৌদি বলেছিল—তোমার পছন্দ আছে ঠাকুরপো। শ্যামল মেয়েদের প্রেমে স্নিগ্ধতা আছে, ঝাঁঝ নেই।

—তাহলে দাদারও পছন্দ আছে বলো?

এক চিলতে হাসি। মিষ্টি বৌদির হাসিটাও মিষ্টি। তারপরেই বৌদির কালীঘাটের মন্দিরে যাবার ভীষণ প্রয়োজন হলো। যাবার আগে চুপি চুপি বলে গেলেন—তোমাদের একটু চান্স দিয়ে যাচ্ছি। এক ঘণ্টা। কিন্তু বেশী দুষ্টুমী করবে না। বৌদি চলে গেল।

সমস্ত ফ্ল্যাটটা ফাঁকা। শান্ত দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে। তারপরেই আরম্ভ হয় শান্তর দুষ্টুমী। পিউর জীবনে সে এক পরম রমণীয় সন্ধ্যা, এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি। কিন্তু শান্ত…একটা হোঁচট খায় পিউ। চটির স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে যায়। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ছাল উঠে গেছে। রক্ত বেরোচ্ছে। চিনচিন করে জ্বালাও করছে। বাধ্য হয়ে চটিটা হাতে নিয়ে ফিরে আসতে হয় বড় রাস্তায়।

মুচির কাছে চটিখানা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পিউ। খানিকটা দূরে চায়ের দোকানে এক দঙ্গল ছেলের আড্ডা। সামনের খোলা ট্রানজিস্টারে কিশোরকুমার তারস্বরে গান গাইছে। হঠাৎ ট্রানজিস্টার বন্ধ হয়ে গেল। খালি গলায় শুরু হলো. পাপিয়া পিউ পিউ বনের শাখে… বুঝিবা ডাকে ওগো তোমাকে আমাকে। কমল গাইছে। কিছুদিন আগেও ওকে হাফ-প্যাণ্ট পরে ঘুরতে দেখেছে পিউ। পিউর চেয়ে অনেক ছোট। অথচ পিউকে দেখলেই টিটকারি দেবে। দিনগুলো অদ্ভুতভাবে পালটে যাচ্ছে। এখন ছেলেগুলোকে দেখলে পিউর কেমন যেন ভয় করে। প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। কাদায় ঢিল ছোঁড়ার মতো। বাধ্য হয়েই মুখ নীচু করে চলে যেতে হয়।

--চার আনা দিন দিদি। চটিটা পায়ের কাছে এগিয়ে দিয়ে মুচি বলে ওঠে—একি দিদি, আপনার পা কেটে রক্ত বেরোচ্ছে যে?

—ও কিছু হবে না। চলতে চলতে নিজের মনেই হাসে পিউ। কাটা আঙ্গুলটার দিকে একবার তাকায়। শান্ত, তোমার কথা ভাবতে গিয়ে রক্তপাত হল। তোমার জন্য আমি খানিকটা রক্ত দিলাম। অবশ্য তোমার অজান্তে। বিনা প্রয়োজনে। তবে প্রয়োজন হলে তোমার জন্য আমার সব রক্ত দিতে পারি।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে মাথার ওপর দিয়ে একটা পেঁচা উড়ে গেল। পিউ তাকিয়ে দেখে ওটা জোড়া মন্দিরের মাথায় গিয়ে বসলো। কাটা আঙ্গুলটা এখন বেশ জ্বালা করছে। পিউ তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে।

বাঁদিকের গলিতে ঢুকতেই দেখে সামনে, কৃষ্ণাদের বাড়ির সামনে যেন একটু গোলমাল। ব্যাপারটা গা করেনি পিউ। রকে বসে থাকা ছেলেগুলোর মুখগুলো কেমন যেন থমথমে। চাহনিতে এক অশুভ ইঙ্গিত।

বাড়িতে ঢুকেও পিউ যেন একই দৃশ্য দেখলো। মা আর সোনা নীচু স্বরে কি যেন বলছে। দুজনের মুখই থমথমে। পিউকে দেখেই ওরা কথা বন্ধ করে একসাথে তাকায়। দৃষ্টিতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ওরা যেন পিউর মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়। মা বেরিয়ে যায়। সোনা পিউর কাছে এগিয়ে আসে।

—কিরে সোনা, ওভাবে তাকিয়ে আছিস কেন ?

—কৃষ্ণাদের বাড়ির সামনে দিয়ে আসার সময় কিছু দেখলি না ?

—কেমন যেন একটু থমথমে মনে হলো। কি হয়েছে রে ?

—কৃষ্ণা মারা গেছে।

কথাটা কানে যেতেই পিউ যেন নিজেকে অসুস্থ মনে করে। ক'দিনই বা, বড় জোর মাস তিনেক আগে। দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণা। পৃথিবীর সমস্ত কারুণ্য যেন ওর দু'চোখে।

—পিউদি, অবসর মতো একবার আসবে আমাদের বাড়ি ?

—চলো। এখন আমার কোন কাজ নেই।

—তোমার কি হয়েছে কৃষ্ণা ? চোখ মুখগুলো ও রকম ফোলা ফোলা লাগছে কেন ? ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন করে পিউ।

—কি হয়েছে তা তো জানি না। জান পিউদি, আমি বোধহয় বেশীদিন বাঁচবো না।

—কেন, তোমার আবার মরার কি হলো ?

কোন্ জবাব দেয়নি কৃষ্ণা। ব্যথা ভরা টলটলে মুখখানা বিষাদে ছেয়ে এক গোছা উল এনে দিয়েছিল পিউর সামনে।

—ওদের পাশের বাড়ির কুসুমদিকে দেখেছিস তো ? কুসুমদির সাথে প্রায়ই বিকেলবেলা সেজেগুজে বেড়াতে যেতো। আমি জিজ্ঞাসা করলে বলতো 'পার্টি আছে'। জানিস দিদি. ও যখন সাজতো, আমার দারুণ হিংসে হতো। কুসুমদি আমাকেও একদিন পার্টিতে নিয়ে যাবে বলেছিল। মাকে এসে বলার পর মা রাজী হয়নি।

—পার্টিতে যাবার ফল তো দেখলি। তুই বড় হচ্ছিস সোনা। একটু বুঝে চলার চেষ্টা করিস। আমরা গরিব, আমাদের সামনে যখন কেউ সুখের কথা বলবে বা সহজ সুখের লোভ দেখাবে, তখনই বুঝবি, তার পেছনে কোন অভিসন্ধি আছে। সুখ ঐশ্বর্য কখনও সহজে আসে না।

—তবে যে কুসুমদি বলে, তোর রূপ আছে সোনা, তোর কোনদিন ভাতের অভাব হবে না।

—সো—না। ঠাস করে এক চড় মারে পিউ।

আচমকা চড়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না সোনা। পল্লবিত দুই চোখে অশ্রু। থরথর করে ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে। কাঁপা গলায় বলে—তুই আমায় মারলি দিদি?

পিউর বুকে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে ওঠে। ওর চোখের সামনে সোনাকে ঝাপসা দেখাচ্ছে। দু' হাতে সোনাকে বুকে টেনে নিয়ে পিউ বলতে থাকে—তোর রূপ আছে সোনা। তাই তো তোর নাম রাখা হয়েছিল সোনালী। তোর কোন ক্ষতি হলে আমি কি করে সহ্য করবো বল তো? আমাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অনেকেই এগিয়ে আসবে নানারকম প্রলোভন নিয়ে। সোনা. লোভী লোকগুলোর গায়ে থুথু ছিটিয়ে বলতে পারবি না, আমরা স্বামীর দেওয়া ছেঁড়া কাপড় পরে জীবন কাটাবো তবু তোমাদের সিফন জর্জেট পরবো না। বলতে পারবি না সোনা?

দিদিকে আঁকড়ে ধরে সোনা বলে—পারবো দিদি, নিশ্চয়ই পারবো।

সোনালী পিউর বুক থেকে মাথা তোলে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখে জল নিয়ে দুজনেই হাসছে। হঠাৎ সোনার বুকের দিকে চোখ পড়ে পিউর। জায়গাটা বিশ্রীভাবে ছিঁড়ে গেছে। অঙ্কুরিত বীজ যেমন মাটির বাঁধ মানে না, সোনার যৌবন তেমনি ফ্রক ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আলতো করে সেখানে হাত রেখে পিউ জিজ্ঞাসা করে—তোর আর ফ্রক নেই সোনা?

লজ্জায় মুখ নীচু করে সোনা জবাব দেয়—ভালো ফ্রক আমার একটাই। ওটা বেরোবার সময় পরি।

—ঠিক আছে, কাল আমি তোকে একটা ফ্রকের কাপড় এনে দেবো।

—তুই বস দিদি, আমি তোর চা নিয়ে আসি।

ওর চলে যাবার দিকে চেয়ে চোখ মোছে পিউ। হাত-ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে দেখে সেখানে পড়ে আছে মনি-অর্ডারের সেই টুকরোটা। বাবার কাশির শব্দ ভেসে আসে পাশের ঘর থেকে। পিউ মনে মনে ভাবে, কাল এক কৌটো চব্যনপ্রাশ আর সোনার ফ্রকের ছিট কিনে আনতেই হবে।

—দিদি ঘুমিয়ে পড়লি ?

সোনার ডাকে চোখ তুলে পিউ। চায়ের কাপ হাতে ও দাঁড়িয়ে আছে। ওর বুকের ওপর ওড়নার মতো ঝুলছে একটা গামছা। তারও একপাশে ছেঁড়া। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। সেই ধোঁয়ায় পিউর সামনে সব ঝাপসা হয়ে যায়। শুধু জ্বলজ্বল করে মনি-অর্ডারের এক টুকরো কাগজ।

॥ বার ॥

লিংকিং-টিউবের মাধ্যমে শান্ত মিঃ বোহরার সাথে যোগাযোগ করে।

—বলো শান্ত কি খবর ? মিঃ বোহরার গলা।

—আমাকে একটু বাড়ি যাবার অনুমতি দিন স্যার।

—এইজন্যই তোমরা বাঙ্গালী। বড্ড গৃহগত প্রাণ। একটা জবাব দেবে শান্ত ?…খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার মিঃ বোহরার গলা শোনা যায়—আচ্ছা, তুমি একটু অপেক্ষা করো আমি আসছি।

মিঃ বোহরা ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসেন। একটা চুরুট ধরিয়ে বলেন—একটা কথা বলো তো, তুমি কি প্রেম-ট্রেম করেছো ?

শান্ত চুপ করে থাকে।

—তোমার কাজটা এত বেশী দায়িত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা আমাকে প্রথমেই খুলে বলা উচিত ছিল। আমাদের কারুর মুহূর্তের অসাবধানতায় সবাইকে

কি প্রচণ্ড বিপদে পড়তে হতে পারে বুঝতে পারছো? অথচ ইন্টারভিউ দেবার সময় তুমি বলেছিলে, কোন মেয়ের সাথে তোমার কোন অ্যাফেয়ার নেই।

—চাকরিটা পাবার জন্যই মিথ্যে বলেছিলাম। তবে আপনার আপত্তি থাকলে আমি যেতে চাই না। শান্ত মাটির দিকে চেয়ে ধীর গলায় জবাব দেয়।

—শান্ত, তুমি বুদ্ধিমান। একটু ভেবে দেখো, তুমি যে কাজ নিয়েছো, এর পর কি তুমি সেই মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারো? সব কিছু শোনার পর মেয়েটি কি তোমাকে আগের মতো গ্রহণ করতে পারবে? দ্বিতীয়তঃ চাকরির কাজের কথা মেয়েটিকে বলা বিপজ্জনক। আবার সব কিছু চেপে গিয়ে প্রেম বজায় রাখাও মনুষ্যত্বের দিক থেকে ঠিক নয়। এ অবস্থায় তোমাকে একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মোট কথা, মেয়েটির কথা তোমাকে ভুলতে হবে। এ চাকরিতে কোন পিছুটান থাকলে চলবে না। একবার ঢুকলে এখান থেকে আর বেরোনো যায় না। তাছাড়া ভুলে যেও না, তুমি একজন ক্রিমিন্যাল। অবশ্য কোনদিন যদি এ কাজ বন্ধ করে দিই, তখন তুমি আবার তোমার সামাজিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে। ততদিন নিশ্চয়ই তুমি মেয়েটিকে আটকে রাখতে চাইবে না! তাছাড়া তখন তোমার মেয়ের অভাবও হবে না। মানছি পুরুষের জীবনে মেয়েদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু একটি মেয়ে ধরে আঁকড়ে থাকবে তারাই যারা তোমার মতো সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান নয়। আমি তো বলছি কয়েক বছর পরেই তুমি তোমার অপরাধীর মুখোশটা খুলে ফেলে আবার তোমার সামাজিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে। কথা দিচ্ছি, একটি সুন্দরী মেয়ে আর একটা প্রতিষ্ঠিত চাকরি আমি তোমাকে দেবো।

শান্ত অবাক বিস্ময়ে মিঃ বোহরার কথা শুনছিল। হঠাৎ মনে হলো, ঠিকই তো সে একজন ক্রিমিন্যাল ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং পিউকে ভালোবাসার তার কোন অধিকার নেই। হয়ত এই খেলা একদিন শেষ হবে, কিন্তু সেদিন কি শান্ত পিউকে এই সব কথা বলতে পারবে? তাহলে আর বীথির সাথে পিউর কি পার্থক্য রইলো?

—তুমি এক কাজ করো শান্ত, গেস্ট হাউসে গিয়ে বিশ্রাম নাও। সেই সঙ্গে সব কিছু চিন্তা করে দেখো। পরে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

জীবনটা উপভোগ করো। আজেবাজে সেন্টিমেন্টকে একদম পাত্তা দেবে না। ভগবানের একটা উপহার তোমার আছে—তোমার রূপ-যৌবন-স্বাস্থ্য। বাকী শুধু অর্থের। তার জন্য তো আমিই আছি। যাও বিশ্রাম করোগে।

মিঃ বোহরা ঘর থেকে বেরিয়ে যান। শান্ত কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকে। ঘরের মধ্যে আটকে পড়া সাপের মতো শান্তর মন তখন একটা পথ খুঁজছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া তো সহজ, কিন্তু কি বলবে পিউকে? নিঃশব্দ দুই চোখের চাহনিতে পিউ অনেক কথা বলে। একটা দিনের কথা মনে পড়ে···হাসতে হাসতে শান্ত পিউকে বলেছিল—আচ্ছা পিউ, তুমি যে আমাকে ভালোবাস তার কোন প্রমাণ দিতে পার?

আচমকা কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল পিউ। তারপরেই কঠিন হয়ে গেলো।—কি প্রমাণ চাও তুমি?

পিউর চোখে চোখ রেখে শান্ত শুধু বলেছিল—এই মুহূর্তে সমস্ত জামা খুলে প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে। পারবে?

পিউর কঠিন অভিব্যক্তির কোন পরিবর্তন হয় না। আধা খাওয়া চায়ের কাপটা সরিয়ে রেখে পিউ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। আঁচলটা সরিয়ে দিয়ে ব্লাউজের বোতামগুলো পটাপট খুলতে থাকে। কলকাতার এক নিভৃত রেস্টুরেন্টের কোণে দম বন্ধ করে বসে থাকে শান্ত। শুধু ব্রা পরে দাঁড়িয়ে আছে পিউ। এবার পেছনে হাত দিয়ে ব্রা-এর হুকটাও খুলে ফেলে। আর সহ্য করতে পারে না শান্ত। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে সজোরে পিউর হাতদুটো চেপে ধরে।

—পিউ, আর কোনদিন তোমার ভালবাসার প্রমাণ চাইবো না। এবার এগুলো পরে ফেল লক্ষ্মীটি।

—কি, পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল? স্থির চোখে পিউ প্রশ্ন করে।

—তোমার পায়ে পড়ছি পিউ, ওগুলো তাড়াতাড়ি পরে ফেল।

কোন জবাব না দিয়ে পিউ আবার ওগুলো পরতে থাকে।

—দাঁড়াও আরও দু'কাপ চায়ের কথা বলে আসি। শান্ত কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে যেন নিজেকে বাঁচায়। আবার আস্তে আস্তে ফিরে যায় কেবিনে। —আমায় ক্ষমা কর পিউ। স্রেফ ঠাট্টা করে তোমাকে বলেছিলাম। কথা দিচ্ছি এরকম ঠাট্টা আর কোনদিন করবো না।

অনেক দূর থেকে ভেসে আসা সুরের মতো পিউ বলে—যাকে ভালোবেসে ঘরে তুলবে তাকে একটু বাজিয়ে নেবে বইকি। আমি অতি সাধারণ এক মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে শান্ত। অর্থের জোর আমার নেই একশ বার স্বীকার করছি। কিন্তু মনের জোর পরীক্ষা করলে ইতিহাসের সেলিম-আনার, হীর-রণমা, কিংবা রোমিও-জুলিয়েটের থেকে কোন অংশে কম যাবো না। ওইটুকু সম্বল করেই তো বেঁচে আছি।

—শান্ত। লিংকিং-টিউবে মিঃ বোহরার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।—তুমি কি ওই ঘরেই বসবে না গেস্ট হাউসে যাবে?

—আমি গেস্ট হাউসেই যাচ্ছি।

গুপ্তঘর থেকে বেরিয়ে শান্ত গেস্ট হাউসের দিকে চলতে থাকে। বিরাট বাড়িটায় অনেকগুলো চোরাগলি। বাইরে থেকে দেখলে বাড়িটার এত রহস্য বোঝাই যায় না। কথাটা মনে হতেই শান্তর মনে হয় মানুষকেই কি বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায়? সুদর্শন যুবকের মুখোশের আড়ালে শান্তই তো একজন ক্রিমিন্যাল। একের পর এক অপরাধ করাই তার কাজ। শ্যামবাজারের মাংসের দোকানের ইয়াসিনের কথা মনে পড়ে। কেমন নির্বিকারভাবে একটার পর একটা পাঁঠা কেটে চলেছে। কাটা পাঁঠার দাপাদাপি দেখে শান্ত আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। মাংস না কিনেই চলে এসেছিল। পরে একদিন ইয়াসিনকে জিজ্ঞাসা করেছিল—ইয়াসিন, তুমি যে এরকম জীবহত্যা করো তোমার পাপ হয় না? খোদাতালার কাছে কি জবাব দেবে?

—এ তো আমার কাজ বাবুজী। আপনারা যখন বাড়িতে জ্যান্ত মাছ কাটেন সেটাও তো পাপ? যুদ্ধে শত্রুহত্যায় কোন পাপ নেই। বাবুজী, একজনকে বাঁচতে হলে অন্যকে মরতেই হবে। এটাই তো পৃথিবীর নিয়ম।

ইয়াসিন ঠিক বলেছে। একের বাঁচার জন্য অন্যকে মরতেই হবে। বাঁ হাতের গলিটায় বাঁক নিতেই শান্ত অন্ধকারে ঢোকে। দু'পাশে খাড়া পাঁচিল। অপরদিকে অনেকগুলো ঘর। সে ঘরগুলোর রহস্য শান্তর কাছে আজও অজানা। কোথায় প্রবেশপথ তাও জানে না। অন্ধকার গলির বাঁকে বাঁকে একটা করে ছোট আলো। দুপুরের চড়া রোদেও গলিগুলো অন্ধকার। একটা পুরানো ভ্যাপসা গন্ধ। আরেকবার বাঁক

নিতেই গেস্ট হাউসের গলির মুখে কিঞ্চিৎ আলো দেখা যায়। নিজের জুতোর আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না। হঠাৎ যেন একটা ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। শান্ত কান পাতে। অস্পষ্ট কান্না দেওয়ালের ওপাশ থেকে ভেসে আসছে। শান্ত দেওয়ালে কান চেপে ধরে। অস্পষ্ট কান্নার সাথে আরও একটা আওয়াজ যোগ হয়। কে যেন মন্থর গতিতে হেঁটে আসছে। শান্ত দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়। অপরিসর গলি। সুতরাং শান্তর চোখ এড়িয়ে কেউ যেতে পারবে না। আগন্তুকের অপেক্ষা করে শান্ত। হয়ত শান্তর মতোই আর একজন ক্রিমিন্যাল।

শব্দটা ক্রমে এগিয়ে আসতে আসতে একসময় মিলিয়ে যায়। শান্ত উত্তেজিত হয়ে দেওয়াল খামচে ধরে। খানিকটা চুন সুরকি ঝরে পড়ে। ঘন ঘন নিশ্বাসে শান্ত উত্তেজনা প্রশমিত করার চেষ্টা করে। মনে মনে ভাবে দেওয়ালের ওপাশেও চোরাগলি আছে। কে কাঁদছে দেওয়ালের ওপাশে ? বীথি না পিউ ? নাকি এ শান্তর নিজেরই কান্না······

গলির দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। গলির শেষ প্রান্তের আলোটা যেন আগের চেয়ে উজ্জ্বল মনে হয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে শান্ত এগিয়ে যায়।

গেস্ট হাউসের দরজার কাছে এসে পৌঁছোতেই দেখে দরজার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন মিঃ বোহরা। চোখাচোখি হতেই মিঃ বোহরার দৃষ্টিটা কেমন যেন প্রসারিত হয়ে যায়। বোধহয় শান্তর বুকের ভেতরটা ও দেখবার চেষ্টা করেন। শান্তও স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

—তোমার আগেই আমি পৌঁছে গেছি শান্ত। মিঃ বোহরার কথায় যেন ঈষৎ সন্দেহের ছোঁওয়া।

—জুতোর ফিতেটা বাঁধবার জন্য নীচু হতেই হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল, তাই একটু দাঁড়িয়ে ছিলাম। কথাগুলো কৈফিয়তের মতো বেরিয়ে আসে শান্তর মুখ দিয়ে।

—প্রেসারটা একবার চেক করিয়ে নিও। এত অল্পবয়সে মাথাঘোরা ঠিক নয়। আর অন্ধকারে তাড়াতাড়ি পথ চলাটাও অভ্যাস করে নাও। কেন না অন্ধকারই তোমাকে বাঁচাবে। শরীর এবং মনের কোন দুর্বলতাই আমি পছন্দ করি না। সন্ধ্যের পর আমি তোমাকে একজন ডাক্তারের

কাছে নিয়ে যাবো। এখানে বিশ্রাম নাও। কুহেলি তোমাকে দেখাশোনা করবে। আশা করি ওর সান্নিধ্যে মনের দিক থেকেও তুমি তাজা হয়ে উঠতে পারবে। কথাগুলো শেষ করে মিঃ বোহরা ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে যান। বোহরার পায়ের আওয়াজটা যেন পরিচিত মনে হয়।

—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন বসুন। কুহেলি অনুরোধ করে।

শান্ত সোফায় বসে পড়ে।

—কি ভাবছিলেন ?

—ভাবি তো অনেক কিছু। কি ছিলাম, কি হলাম, কি হবো কে জানে।

—ভাববেন না। আপনার কাজ শুধু নির্দেশ অনুযায়ী পথ চলা। নিজে পথ খুঁজতে গেলেই বিপদে পড়বেন।

—জানি।

—সব জেনেও মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলেন। দেওয়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে কি শোনবার চেষ্টা করছিলেন ?

চমকে ওঠে শান্ত। অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি করে জানলে ?

—যে করেই হোক জেনেছি। আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে মিঃ বোহরাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করবেন। নিজে বোঝবার চেষ্টা করবেন না। মিঃ বোহরার সন্দেহ হলে আপনি অবিশ্বাসী হয়ে যাবেন। এখানে অবিশ্বাসীদের কোন ঠাঁই নেই।

এক নিমেষে শান্ত যেন চুপসে যায়। অস্ফুট স্বরে বলে—আমি আর পারছি না কুহেলি। নিজের সাথে নিজে ঝগড়া করি। ক্ষতবিক্ষত হই। কতদিন এ ভাবে বাঁচবো বলতে পারো ?

—ও সব সস্তা সেন্টিমেণ্টগুলো ঝেড়ে ফেলুন। জলে যখন নেমেছেন সাঁতার আপনাকে কাটতেই হবে। লেখাপড়া শিখে যখন ঠগ-জোচ্চোরের লাইনে এসেছেন, তখন বিবেকের কথা ভেবে কি কোন লাভ আছে ?

—দারুণ ভুল করেছি। বেকারত্বের জ্বালা সইতে না পেরে এমন একটা লাইন বেছে নিলাম—

শান্তকে কথা শেষ করতে না দিয়ে হেসে ওঠে কুহেলি—আপনার নামের সাথে কিন্তু প্রকৃতির কোন মিল নেই। নাম শান্ত, কিন্তু সহজেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। পরক্ষণেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় কুহেলি। ধীর গলায় বলতে থাকে—কিছু লোক ভুল না করলে পৃথিবীটা অচল হয়ে যেতো শান্তবাবু। অপরাধ না থাকলে আইন আদালত চলতো না। এক পক্ষ ক্রেতা, অন্য পক্ষ বিক্রেতা। আপনি পুরুষ। আপনি কেন অতীত চিন্তা করে কাঁদতে বসছেন? বুদ্ধি খরচ করে একজন দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যাল হন। পৃথিবী আপনার সামনে মাথা নীচু করবে। ইমোশন্যাল হবেন না।

—জানো কুহেলি, আমি একজনকে ভালোবাসি, সেও আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। কি করে সে সব কথা ভুলি বলো তো?

—আপনি না বললেও আমি জানতাম। কিন্তু ভুলতে আপনাকে হবেই। নিজেই ভেবে দেখুন না, আপনার ভালোবাসা কি আগের মতো পবিত্র আছে? যে কথাগুলো আপনি তাকে বলবেন সেগুলো অনেক ব্যবহারে পুরানো। রাতের পর রাত বিভিন্ন মেয়ের সাথে এক বিছানায় কাটিয়ে কথাগুলো আপনি অনেকবার বলেছেন। মেয়েদের বেলায় বলা হয় বেশ্যাবৃত্তি। শান্তবাবু, আপনাকে পুরুষ বেশ্যা বললে কি খুব অন্যায় করবো? এবার বলুন কোন অপরাধে ঐ মেয়েটি আপনার মতো একজন চরিত্রহীন লোককে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে?

শান্ত স্তব্ধ। কোন কথা নেই ওর মুখে। ক্লান্তিতে সোফায় নিজেকে এলিয়ে দেয়। ওর চোখ বুজে আসে।

– স্নান সেরে নিন। আমি আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করি। কুহেলি বেরিয়ে যায়। শান্ত শ্লথগতিতে জামা জুতো ছেড়ে বাথরুমে ঢোকে।

টেবিলে খাবার প্রস্তুত। কুহেলিও বসে আছে পাশে। শান্ত নিঃশব্দে খেতে থাকে। কুহেলিও কোন কথা বলে না। শান্ত একসময় দেখে কুহেলি খাচ্ছে না।

—তুমি খাচ্ছ না কুহেলি?

—আপনি খেয়ে নিন। আমি পরে খাবো।

—না না, এসো আমরা একসাথে খাই।

—শান্তবাবু, আপনি যেন কোন অজুহাতে সেই মেয়েটির সাথে দেখা করার চেষ্টা করবেন না।

—কোন্ মেয়েটির সাথে ?

—আপনি যাকে ভালোবাসেন।

—তোমার কোন আপত্তি আছে ?

—আমার আপত্তিতে আপনার কি এসে যায় ? তবু অনুরোধ করছি, আপনি যাবেন না।

শান্তর খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। নিঃশব্দে ওর সামনে বসা দুর্বোধ্য মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে।

কুহেলির চোখে এক বিষাদমাখা দৃষ্টি। শুধু বলে—খাচ্ছেন না কেন ? খেয়ে নিন।

॥ তের ॥

গুপ্তঘরে সবাই জমায়েত হয়েছে। প্রত্যেকের ভেতরেই একটা উৎকণ্ঠা। বসে আছে শান্ত, তপন এবং সুধীর হালদার। কিছুক্ষণ পরে মিঃ বোহরা ঘরে ঢোকেন। গম্ভীর থমথমে মুখে একটা জ্বলন্ত চুরুট। কোন ভূমিকা না করে তিনি বলতে থাকেন—তোমরা সবাই জান আমরা যে কাজে নেমেছি সেটা একটা অসামাজিক অপরাধের কাজ। এ কাজে একদিকে যেমন টাকা আছে অন্যদিকে আছে বিপদের ঝুঁকি। যে কোন একজনের সামান্যতম দুর্বলতা সকলের বিপদ ডেকে আনবে। প্রসঙ্গতঃ আমি শান্তর কথা বলছি। শান্ত আমাকে না জানিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে একটি মেয়েকে টাকা পাঠায়। অথচ এটা যে কতখানি বিপজ্জনক সেটা শান্তর বোঝা উচিত। কিন্তু এ জিনিস যদি চলতে থাকে, তবে শান্তর বিরুদ্ধে অন্য ব্যবস্থা আমাকে বাধ্য হয়ে নিতে হবে। তপনের বাড়ির ঠিকানায় আমরাই টাকা পাঠিয়ে দিই। কই তপন তো কিছু লুকোচুরি করেনি। আমি শেষবারের মতো শান্তকে সাবধান করে দিচ্ছি। এরপর শান্ত কোন গোপনীয়তার আশ্রয় নিলে সেটা তার প্রাণের বিনিময়েই নিতে হবে। শান্তর যদি কিছু বলার থাকে বলতে পারে।

শান্ত মাথা নীচু করে এতক্ষণ সব শুনছিল। তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য। তবু তার কিছু বলা উচিত। শান্ত আস্তে আস্তে মাথা তোলে—মিঃ বোহরার সব অভিযোগ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। দরিদ্র এবং বেকারত্বের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই আমি মিঃ বোহরার কাছে মিথ্যা কথা বলেছিলাম। যাই হোক আমি প্রতিজ্ঞা করছি, অতীতের সব দুর্বলতা এবং সম্পর্ক আমি মুছে ফেলবো। পিয়ালীকে শেষবারের মতো আমি একখানা চিঠি লিখবো এবং সে চিঠি মিঃ বোহরার মারফৎ ডাক বাক্সে যাবে। সেই সঙ্গে আমার অপরাধের জন্য আমি মিঃ বোহরার কাছে ক্ষমা চাইছি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে আসেন মিঃ বোহরা। শান্তর কাঁধে হাত রেখে বলেন—আমি জানি তুমি বুদ্ধিমান। অনেকবার বলা কথা আরও একবার বলছি যে, এখানকার কোন একজনের বিপদ শুধু তার একার নয়। যাই হোক অতীতের সব কিছু ভুলে গিয়ে আমরা আবার নতুন স্কীম হাতে নিচ্ছি। মিঃ বোহরা নিজের চেয়ারে ফিরে যান।—শান্ত তুমি একটু পাশের ঘরে যাও। আমি তপনের কাজটা তপনকে বুঝিয়ে দিয়ে তোমাকে ডাকছি।

শান্ত চলে যায়। মিঃ বোহরা চেয়ারটা তপনের কাছে টেনে এনে বলেন—একজন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা তোমার বাবা এবং মা। গোবরডাঙ্গার নিভৃত পরিবেশ ভাল লেগেছে বলে অবসরপ্রাপ্ত তোমার বাবা ওখানেই বাড়ি করে থাকতে চান। তুমি মনেপ্রাণে পোশাকে ব্যবহারে সম্পূর্ণ বাঙ্গালী। সারা মুখে ঘন চাপ দাড়ি। কলকাতার বাইরে একটা কলেজে তুমি অধ্যাপনা করো। স্বল্পভাষী মিষ্টি ব্যবহারে তুমি সবার শ্রদ্ধার পাত্র। পড়াশুনা ছাড়া বিশেষ কিছু ভালো লাগে না। জমি জমা কেনার ব্যাপারেও তোমার বিশেষ কোন আগ্রহ নেই। নেহাত বাবার অনুরোধেই এসেছো। ওদিকে সুধীর দালালের কাজ করবে। সেই সাথে ঝোপ বুঝে কোপ মারার মতো তোমার ব্যাপারে কন্যাদায়গ্রস্থ বাবাদের মনে আগ্রহ জন্মাবে। এইভাবে কিছুদিন পরে একটি মেয়ের সাথে তোমার প্রেম এবং বিয়ে। ব্যস, তোমার কাজ শেষ।

—কাজ কবে থেকে আরম্ভ হচ্ছে? তপন জিজ্ঞাসা করে।

—আগামী মাসের পনের তারিখ থেকে।

—কিন্তু শেলী যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে ?

—আমি বলে দেবো তুমি কিছুদিনের জন্য অফিসের কাজে বাইরে গেছ। আজ সন্ধ্যেটা গেস্ট হাউসে কাটাতে পার। বীথি আছে কুহেলি আছে আশা করি তোমার খারাপ লাগবে না।

—না স্যার। ফ্ল্যাটেই ফিরে যাব। আমার এক বন্ধুর আসবার কথা আছে। ওর সাথে একটু বেরোবো।

—সাবধানে বেরিও।

—ঠিক আছে স্যার।

তপন বেরিয়ে যায়। সেদিকে তাকিয়ে মিঃ বোহরা লিংকিং-টিউবের বোতাম টেপেন।

ঘরে ঢোকে শান্ত। সোজা এসে মিঃ বোহরার সামনে বসে। মিঃ বোহরা বলতে থাকেন—শোন শান্ত, তোমার কাজটা একটু সময় নিয়ে করতে হবে। মাঝদিয়ায় এক ডাক্তার আছেন। নাম অধীর সান্যাল। তাঁর মেয়ে সুন্দরী এবং শিক্ষিতা। বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই মেয়েটি বিধবা হয়। ডাঃ সান্যাল সাত্বিক ব্রাহ্মণ। মেয়েটি ছাড়া পৃথিবীতে তাঁর আর কেউ নেই। মেয়ের বৈধব্যে ভদ্রলোক খুবই শক্ড্। তাঁর ধারণা মেয়েকে প্রাণ দিয়ে স্নেহ করতেন বলেই বোধ হয় মেয়ে তার স্বামীর ঘর করতে পারলো না। পাড়া-প্রতিবেশী অনেকে মেয়ের পুনর্বিবাহের কথা তুললে তিনি মারমুখো হয়ে ওঠেন। ভদ্রলোকের ধারণা মেয়েকে আবার বিয়ে দিলে সে আবার বিধবা হবে। এক জটিল মানসিক রোগে ভুগছেন ডাঃ সান্যাল। এদিকে মেয়েটির কিন্তু বিয়েতে খুব আপত্তি নেই। তাই বাবা বেঁচে থাকাকালীন তার বিয়ে হবে না এটাই সে জেনে নিয়েছে।

এখান থেকেই তোমার কাজ শুরু হবে শান্ত। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ সেজে তোমাকে সেখানে যেতে হবে। ডাঃ সান্যালের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তার মেয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে একেবারে প্রেমে হাবুডুবু খাওয়াতে হবে। তোমার বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার ওপরই সব নির্ভর করছে। মেয়েটির কাছে তার বাপের বাড়ি এবং শ্বশুর বাড়ির মিলিত গহনার দামই হবে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা।

শান্ত যেন একটু উত্তেজনা অনুভব করে। কাজ নিয়েই তাকে থাকতে

হবে। পিউকে ভোলবার ওটাই একমাত্র পথ। সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করে—কবে থেকে কাজ আরম্ভ করছেন?

মিঃ বোহরার চোখে এক দুর্বোধ্য হাসি। মৃদুস্বরে বলেন—দিন-পাঁচেকের জন্য তোমাকে একটা ট্রেনিং নিতে হবে। কয়েকটা ওষুধ সম্বন্ধে তোমাকে কিছু জেনে নিতে হবে। দিন-তিন-চারেক সেখানে থাকবে, তারপর চলে আসবে কলকাতায়। আগামীকাল তুমি বম্বের একটা ওষুধ কোম্পানিতে যাবে। সেখানে তোমাকে সব কিছু বুঝিয়ে দেবার জন্য লোক থাকবে। আজ রাতটা তুমি কুহেলির কাছে থাকবে। তোমার ফ্ল্যাটে থাকবে সুধীর।

—ঠিক আছে স্যার।

—দুপুরে তোমার সিনেমায় যাবার কথা ছিল, যাওনি। সন্ধ্যের শো'তে যেতে পারো।

—সিনেমায় যেতে ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে আউটরাম বা ভিক্টোরিয়ার খোলা জায়গায় একটু বসতে চাই।

—একা যেও না। কুহেলিকে সঙ্গে নিও। ওরও বেরোনো হয় না। ঘরের মধ্যে থেকে থেকে ওরও দম বন্ধ হয়ে আসছে। অবশ্য তোমার যদি খুব আপত্তি থাকে……

—না স্যার, সে রকম কোন আপত্তি নেই।

—তাহলে ওকেও নিয়ে যেও। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি; তোমাদের যতক্ষণ খুশী ঘুরবে বেড়াবে, আবার আমার গাড়িতেই ফিরে আসবে। কুহেলিকে আমি তৈরি হয়ে নিতে বলে দিচ্ছি।

লিংকিং-টিউবের মাধ্যমে মিঃ বোহরা কুহেলির সাথে কথা বলেন। শান্তর দিকে চেয়ে বলেন—মেয়েটি অসম্ভব বুদ্ধিমতী। বনের পাখি খাঁচায় পুরেছি। পায়ে সুতো না বেঁধে উড়তে দিতে ভরসা হয় না। যাই হোক, সুধীরের কাছ থেকে তোমার কাজের টুকিটাকি জিনিস জেনে নিতে পারো। আমি গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

মিঃ বোহরা ঘর থেকে বেরিয়ে যান। শান্ত তাকায় সুধীর হালদারের দিকে। ধুতি শার্ট পরা অতি সাধারণ লোক সুধীর হালদার। গৃহস্থ ঘরের আনাচে কানাচে কোথায় কি ঘটছে সব খবর জানে এই লোকটা। অথচ চেহারা দেখে ধরার উপায় নেই।

—বলুন সুধীরবাবু, আমার নতুন কাজ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

পানের ছোপ ধরা দাঁত বার করে সুধীর হালদার হাসে। ওরা কথা বলতে থাকে।

সি. সি. এ-র বিরাট বাড়িখানার অন্ধকার গলিতে আবার জেগে ওঠে ভারী বুটের আওয়াজ। নিস্তব্ধ গলির নীরবতা ভেঙে আওয়াজটা এসে থামে কুহেলির ঘরের সামনে। কুহেলি দরজা খুলে দেয়।

—তোমাকে আজ দারুণ সুন্দর লাগছে কুহেলি। কুহেলি জবাব না দিয়ে একটু হাসে। শোন অনেকদিন তুমি বেড়াতে বেরোওনি। শান্ত বেরোনোর জন্য ছটফট করছে। কিন্তু ওকে একা ছেড়ে দিতে ভরসা পাচ্ছি না। আমার গাড়িতে ওর সাথে তুমিও থাকছো। ওর খুশী মতোই চলবে শুধু ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। দুর্বলতায় হয়ত তোমার সাথে একটু প্রেম-ট্রেমও করতে পারে। হাওয়া বুঝে তুমি ওকে ট্যাক্‌ল করবে। আজ রাত্রে ও তোমার কাছেই থাকবে, ওকে যতটা পার মেসমেরাইজড করার চেষ্টা করবে। দশটার মধ্যে ফিরে এসো। তোমার সাজগোজ হয়ে গেলে গাড়িবারান্দার তলায় এসো। শান্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করবে।

মিঃ বোহরা আবার ফিরে যান। একটা বন্ধ ঘরের দরজায় কান পাতেন। ভেতর থেকে অস্পষ্ট কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। মিঃ বোহরা উত্তেজিতভাবে কয়েকবার মাথা নাড়ান। তারপর আবার অন্ধকার গলিপথে হারিয়ে যান।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে কুহেলি। এক মোহময়ী নায়িকা। চোখের পাতায় সবুজ আইলাইনার। ঠোঁটে আলতো লিপস্টিকের ছোঁওয়া। কুহেলি দরজা টেনে বেরিয়ে আসে বাইরে। সেই অন্ধকার গলি। সেই অস্পষ্ট কান্নার আওয়াজ। কুহেলি চলতে থাকে। গলির বাঁকে নিষ্প্রভ আলোটার দিকে তাকায়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কুহেলি পায়ে পায়ে চলতে থাকে।

গাড়িবারান্দায় এসে দেখে শান্ত ড্রাইভারের সাথে কথা বলছে। মাঝে মাঝে এক ঝলক হাওয়া শান্তর কোঁকড়ানো চুলগুলো আলুথালু করে দেবার চেষ্টা করছে। বারান্দার আড়াল থেকে কুহেলি শান্তকে দেখে। কি একটা কথায় শান্ত হাসছে। ভারী সুন্দর হাসি। কুহেলির মন থেকে

বিষণ্ণ ভাবটা কেটে গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ভারী গলার আওয়াজ ভেসে আসে—কি ভাবছো? যাও। বেচারা প্রায় কুড়ি মিনিট তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

পেছনে তাকিয়ে কুহেলি মিঃ বোহরাকে দেখতে পায়। কুহেলি মুখে হাসি ছড়িয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। মিঃ বোহরা হাত নেড়ে বিদায় জানায়। গাড়ি চলতে শুরু করে।

—কোথায় যাবে বলো? শান্ত জিজ্ঞাসা করে।

কুহেলি আলতো করে একবার তাকিয়ে জবাব দেয়—প্রথমে আউটরাম ঘাট। কিছুক্ষণ পর ইডেন গার্ডেনস। তারপরেও যদি সময় থাকে তাহলে ভিক্টোরিয়ার সামনে একটু বসবো, নয়তো চলে যাবো।

ড্রাইভারকে আউটরাম ঘাটে যাবার নির্দেশ দিয়ে শান্ত কুহেলির দিকে তাকায়। রাস্তার পাশে ছিটকে আসা আলোয় শান্ত কুহেলিকে দেখে, মনে হয় স্বপ্নলোকের রাজকন্যা। সত্যি কুহেলি সাজতে জানে।

—কি হলো, আপনি কোন কথা বলছেন না তো?

—বলবো, অনেক কথা বলবো। গাড়ির এই বন্ধ বাতাসে নয়। খোলা হাওয়ায় নির্জন প্রান্তরে। কুহেলি, তুমি গান গাইতে পারো?

—একটু একটু জানতাম। অনেকদিনের অনভ্যাসে ভুলে গেছি। তবে মাঠে ঘাটে গাইবো না। আজ রাতে তুমি আমার কাছে থেকো।

—মিঃ বোহরা আজ রাতে আমাকে তোমার কাছেই থাকতে বলেছেন।

ওরা আউটরাম ঘাটে এসে পৌঁছোয়। সন্ধ্যে হয়েছে। গঙ্গার ওপারে সারি সারি আলোর বিন্দু। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ওরা হাঁটতে থাকে। গঙ্গায় ছোট বড় জাহাজের ভিড়। ওরা একটা বসবার জায়গা পেয়ে বসে। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কুহেলি কোথায় যেন হারিয়ে যায়। শান্ত একটা সিগারেট ধরায়।

—কি ভাবছো? শান্তর প্রশ্নে কুহেলি নিজেতে ফিরে আসে।

—জানো, আমার মাঝে মাঝে জাহাজে করে অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে। সমুদ্রের ঢেউ, নোনা জলের খেলা। ভোরের সূর্য থেকে রাতের অগুনতি তারা দেখতে দেখতে শুধু চলবো আর চলবো।

তারপর একসময় পৌঁছে যাবো কোন জনমানুষহীন নির্জন দ্বীপে। সেখানে গাছের ফল খেয়ে আমার জীবন কাটবে। রাতে জোনাকজ্বলা অন্ধকারে শুনবো ঝিঁ ঝিঁ পোকার গান আর অরণ্যের কান্না, আকাশে দুলবে নক্ষত্রের আলো। সঙ্গী হিসেবে থাকবে শুধু চাঁদ।

—তারপর একদিন হঠাৎ সেখানে আসবে এক রাজপুত্তুর। বেলাভূমিতে মানুষের পায়ের ছাপ দেখে সে চমকে উঠবে। তারপর সে পদচিহ্ন অনুসরণ করে সে এক সময় একটা পায়ে চলা পথের সন্ধান পাবে। সেই পথ ধরে সে এসে পৌঁছুবে একটা পাহাড়ের সামনে। তার কানে ভেসে আসবে এক সহজিয়া ঝর্ণার গান। খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত রাজপুত্তুর ঝর্ণার ধারে একটা পাথরে বসে পড়বে। এক সময় হঠাৎ আবিষ্কার করবে এক অনিন্দ্যসুন্দর রাজকন্যা ঝর্ণার জলে স্নান করছে। রাজকন্যার স্নান সারা হলে সে আস্তে আস্তে নীচে নেমে আসবে। একেবারে রাজকন্যার মুখোমুখি। রাজকন্যা ভয়ে রাজপুত্তুরের দিকে তাকাবে। রাজপুত্তুর এমনি করে জড়িয়ে ধরে বলবে, ভয় পেও না রাজকন্যা, আমি অমুক দেশের মানুষ। তোমাকে আর একা একা নির্জন সঙ্গীহীন দ্বীপে দিন কাটাতে হবে না।

—আঃ ছাড়ো ছাড়ো···এটা আউটরাম ঘাট, তোমার জনহীন নির্জন দ্বীপ নয়।

শান্ত কুহেলিকে ছেড়ে দেয়। কুহেলি মুখ নীচু করে বলে—কিছু মনে করবেন না, আমি আপনাকে 'তুমি তুমি' করে সম্বোধন করে ফেলেছি।

—যা স্বতঃস্ফূর্ত তাকে বাধা দিতে নেই। এবার থেকে আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করলেই বেশী খুশী হবো।

—ইস্, প্রায় ন'টা বেজে গেল। চলুন ফিরে যাই। আর কোথাও যাওয়া হলো না।

—উঁহু, আগে 'তুমি' করে সম্বোধন করো।

—চলো অনেক রাত হয়ে গেছে। দাঁড়ানো অবস্থায় কুহেলি হাত বাড়িয়ে দেয়। শান্ত হাত বাড়াতেই দেখে ড্রাইভার এগিয়ে আসছে। কুহেলি তাড়াতাড়ি বলে—তুমি যাও ড্রাইভার। আমরা আসছি।

ড্রাইভার উলটোদিকে হাঁটতে থাকে। শান্তর ওঠবার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। একটা সিগারেট ধরায়।

—এই, চলো প্লিজ। রাত হয়ে যাচ্ছে।

—আরেকবার বলো। শান্ত দুষ্টুমী করে। চকিতে কুহেলির মনে একবার মিঃ বোহরার মুখখানা ভেসে ওঠে। "একটু-আধটু প্রেম-ট্রেম করতে চাইলে করবে, কিন্তু ওকে সব সময় চোখে চোখে রাখবে।"

—ফিরে চলো অনেকবার বলবো।

শান্ত একটু মুচকি হেসে বলে—চলো। ওরা চলতে থাকে। একটা জাহাজ সিটি দেয়। ভোঁ—ও—ও। কুহেলি শান্তর একখানা হাত চেপে ধরে।

॥ চোদ্দ ॥

সি. সি. এ থেকে বেরিয়ে তপন একটা দোকানে ঢুকে টেলিফোন করে। ও-পাশ থেকে নারীকণ্ঠে নম্বরটা উচ্চারিত হতেই তপন বলে—কে তনু? আমি তপনদা বলছি।

—ওরে বাবা, আপনি ভারতবর্ষে আছেন?

—কেন বল তো?

—দাদা বলছিল তপনটা হয় মারা গেছে নয় ভারত ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে।

—সুবীর কোথায়?

—আপনারই তো বন্ধু। সুতরাং বুঝতেই পারছেন ওর নিজের মুভমেণ্ট ও নিজেও সব সময় জানে না। কোথায় যাচ্ছে বলে যাওয়াটা নাকি ভীতুমী। কখন ফিরবে বলাটা নাকি হাঁদামী। কোন কাজ সাকসেসফুল হওয়ার আগে বলা নাকি পাঁঠামী। সুতরাং এতগুলো ভেজালমিশ্রিত গুণকে দাদা সব সময় এড়িয়ে চলে। তবে সন্ধ্যের দিকে একবার ফিরবে মনে হয়। তারপর বেরিয়ে কলকাতা অভিযান শেষ করে ফিরবে দশটা নাগাদ।

—ঠিক আছে, সন্ধ্যেবেলা ফিরলে বলো আমি সাড়ে সাতটা নাগাদ আরেকবার ফোন করবো। ও যেন বাড়িতে থাকে।

—বলবো। তপনদা, আপনি চাকরি পেয়েছেন নিশ্চয়ই? বাব্বা চাকরি পেলে ছেলেরা নিজেদের কি যে ভাবে।

—বিয়ে হলে মেয়েরা যা ভাবে ঠিক তাই।

ও পাশ থেকে তনুশ্রীর হাসির শব্দ শোনা যায়। পরম তৃপ্তিকর এক হাসি।

—এই তপনদা, আসুন না দাদা না আসা পর্যন্ত এখানে গল্প করবেন!

—তনু, তোমার বিয়ের কথা শুনে আমার কিন্তু তোমার সাথে প্রেম করতে ইচ্ছে করছে।

—প্রেম করতে পারলে অবশ্য খারাপ হতো না। তবে ইতিমধ্যে একটি যুবক অলরেডী আঁচল ধরে ফেলেছে। আসুন না কি ইয়ার্কী মারছেন। আপনার সাবুর পাঁপড়ের ওপর অনুরাগ কি এখনও আছে?

—তা আছে। সত্যি অনেকদিন খাইনি। ঠিক আছে, ছ'টার মধ্যে যাচ্ছি। এর মধ্যে যদি সুধীর এসে পড়ে তবে অপেক্ষা করতে বলো।

—নিশ্চয়ই বলবো। রাখছি।

টেলিফোন রেখে দিয়ে তপন হাতঘড়ির দিকে তাকায়, সাড়ে চারটে বাজে। তপন ফ্ল্যাটে ফিরে আসে। ঘরে ঢুকেই চোখে পড়ে অনেকগুলো জামা-কাপড় ময়লা হয়ে ব্র্যাকেটে ঝুলছে। সময় নষ্ট না করে সবগুলো একটা পুঁটলি করে কাছাকাছি একটা লণ্ড্রীতে দিয়ে আবার ফ্ল্যাটে ফিরে আসে। হাত-মুখ ধুয়ে প্যাণ্টের মধ্যে জামা গুঁজছে এমন সময় কড়া নাড়ার আওয়াজ হয়। তপন দরজায় লাগানো ম্যাজিক-আইতে চোখ রাখে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সুধীর হালদার।

—বেরোচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—মিঃ বোহরা বলেছেন আপনি আগামীকাল বাড়ি যেতে পারেন, দিন দশেকের জন্য। আপনার ফ্ল্যাটের চাবি আমাকে দিয়ে যান। আমিই দেখাশুনা করবো।

—ঠিক আছে, আগামীকাল ভোর ছ'টায় আমি বেরিয়ে পড়বো। তার আগে আপনি চলে আসবেন।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সুধীর হালদার চলে যায়।

সুবীরের বাড়িতে ঢুকেই তপন দেখে তনুশ্রী কোলে উল রেখে একটা সোয়েটার বুনছে। তপনকে দেখে বোনা বন্ধ রেখে হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানায়।

—কতদিন পর এলেন বলুন তো? এতদিন কি বন্ধুর কথা মনে পড়েনি?

—তা প্রায় বছর দেড়েক পরে এলাম। ওঃ, তুমি দারুণ ঝগড়াটে হয়ে গেছ! কই আমার সাবুর পাঁপড় কোথায়?

—ভাজা হচ্ছে, আনছি। আসলে কি জানেন তপনদা, কারও সাথে কথা বলতে ভালো লাগে, কারও দিকে চেয়ে থাকতে, আর কারও সাথে······

—ঝগড়া করতে ভালো লাগে, এই তো?

—ঠিক বলেছেন।

তনুশ্রী ভেতরে চলে যায়। কয়েক মিনিট পরে ফিরে আসে এক প্লেট সাবুর পাঁপড় নিয়ে। টেবিলের ওপর প্লেটখানা রেখে তনুশ্রী জিজ্ঞাসা করে—এবার আপনার কথা বলুন।

—আমার খবর? একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির ফিরিওলা। খাওয়া, থাকা, শোওয়ার কোন ঠিক নেই। তা সুবীর এখন কি করছে?

—দাদাও তো একটা চাকরি ধরছে আর একটা ছাড়ছে। এখন বোধহয় কোন একটা কোম্পানির লিয়াজোঁ অফিসার। আপনার মতো দাদাকেও এখানে ওখানে ঘুরতে হয়। তবে ইদানীং দাদা খুব গম্ভীর হয়ে গেছে।

—এবার ওর একটা বিয়ে দিয়ে দাও। তপন হাসতে হাসতে বলে।

—আমার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত দাদা বিয়ে করবে না। ধনুক ভাঙা পণ।

বাইরে জুতোর আওয়াজ পাওয়া যায়। তনুশ্রীর চোখ দুটো চিকচিক করে ওঠে।—দাদা আসছে।

তপন তাড়াতাড়ি সোফার পিছনে গিয়ে লুকোয়। তনুকে বলে—কিছু বোলো না, দেখি ও কি করে।

সুবীর ভেতরে ঢোকে। সোফার পাশ দিয়ে ভেতরে যেতে গিয়ে ও থমকে দাঁড়ায়। একবার প্লেট ভরতি পাঁপড়গুলোর দিকে তাকায়। দুটো টুকরো মুখে পুরে দিয়ে বলে—তপনটা কোথায় গেল রে তনু?

তনুশ্রী অবাক্ হবার ভাণ করে বলে—কি বলছিস? তপন মানে তোর বন্ধু তপনদা?

—হ্যাঁ রে বাবা।

—তপনদা আবার কোত্থেকে আসবে? হঠাৎ তোর তপনদার কথা মনে হলো কেন?

আরও একটা টুকরো মুখে পুরে সুবীর বলে—প্রথমতঃ এতগুলো সাবুর পাঁপড় তুই বসে বসে খাচ্ছিস, এটা সম্ভব নয়। অর্থাৎ অন্য কারও জন্য ভাজা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যে খাচ্ছিল সে ডানদিকের সোফাটায় বসেছিল। তপন যতদিন এ বাড়িতে এসেছে ওই সোফাটাতেই ও বসেছে। তৃতীয়তঃ তপনের অভ্যাস ডানদিক থেকে খেতে আরম্ভ করা। ছাখ, স্তূপীকৃত পাঁপড়গুলোর ডানদিকটা ফাঁকা। আর একমাত্র তপনই সাবুর পাঁপড় খেতে ভালোবাসে। এতগুলো পাঁপড় ওর মতো রাক্ষস ছাড়া আর কেউ খাবে না। অবশ্য এ সমস্তই আমার ধারণা। আমার ভুলও হতে পারে।

হাসিতে গড়িয়ে পড়ে তনু। হাসতে হাসতে বলে—দাদা, তুই ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টে চাকরি কর। উন্নতি করতে পারবি।

—বলছিস্? তা উল্লুকটা গেল কোথায়?

তপন সোফার পেছন থেকে উঠে দাঁড়ায়। হাসিমুখে বলে—সাবাস সুবীর। তোর লাইন অব থিংকিং দেখে সত্যি আনন্দ পেলাম। তনুর সাথে আমিও একমত। তুই ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টে চাকরি নে।

হো হো করে হেসে ওঠে সুবীর। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে—তোর কি ব্যাপার বল তো? এতদিন কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলি? কথা বলতে বলতে সুবীর আরও কয়েকটা পাঁপড়ের টুকরো তুলে মুখে দেয়।

—এই দাদা, তুই নিজেই সব খেয়ে নিচ্ছিস তো তপনদা কি খাবে?

—কেন? আর কিছু ভেজে আন না। তপনের দিকে তাকিয়ে—মায়ের সাথে দেখা করেছিস?

—না।

—দাঁড়া আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটু বোস আমি হাতে মুখে জল দিয়ে আসছি।

সুবীর ভেতরে চলে যায়। তপন আবার সোফায় ফিরে আসে।

—এবার তোমার আঁচলধরা ভদ্রলোকের কথা বলো তনু।

—নাম উদয় ব্যানার্জী। পেশা একটি বিলিতী ফার্মের মার্কেটিং ম্যানেজার। হবি চুটিয়ে ইংরেজী ম্যাগাজিন আর বিদেশী সাহিত্য পড়া। সপ্তাহে অন্ততঃ একটা ইংরেজী ছবি দেখা। অবশ্যই আমাকে নিয়ে। কথাবার্তায় একটাও ইংরেজী শব্দ উচ্চারণ না করা। খেয়াল খুশি মতো পয়সা ওড়ানো। কিছু বললে উত্তর দেবে—মাস্টারী কোরো না। ওটা আমি পছন্দ করি না। দেখতে সুন্দর নয়, কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যক্তিত্ব আছে। বছর আটেক বিলেতে কাটানোর পরেও মোচার ঘণ্ট দিয়ে ভাত খেতে ভালোবাসে। সব থেকে আকর্ষণীয় হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বললেও একঘেয়ে লাগে না।

—দারুণ! আরে তোমার কথা শুনে তো আমারই প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করছে। কত দিনের আলাপ?

—বছর দেড়েক হবে।

তনুশ্রীর কথা শেষ হবার আগেই মাসীমা ঘরে ঢোকেন।—কতদিন পরে এলে বাবা তপন! কোথায় ছিলে এতদিন?

—আপনার চেহারাটা কিন্তু আগের চেয়ে অনেক খারাপ হয়ে গেছে মাসীমা। তপন প্রণাম করে।

—আর চেহারা! এখন ওপারের দিকে তাকিয়ে আছি।

ইতিমধ্যে ঘরে ঢোকে সুবীর। পাজামা পাঞ্জাবি পরা। হঠাৎ প্লেটের দিকে তাকিয়ে বলে—মা, আমি তপনের অনেকগুলো পাঁপড় খেয়ে নিয়েছি। তুমি ওকে আরও কিছু ভেজে দাও তো?

—দাঁড়াও বাবা, আমি আনছি।

—না-না মাসীমা, সত্যি বলছি আর খাবো না। আমি আর সুবীর এক্ষুনি বেরোবো। চ' সুবীর।

ওরা সুবীরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। পার্ক সার্কাস অঞ্চল। ওরা হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে পড়ে। সুবীর জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাবি?

—তুই ঠিক কর। কাল বাড়ি যাচ্ছি। দিন দশেক থাকবো। তারপর আবার কাজ। মাঝে আবার বাংলার বাইরে। তাই ভাবলাম

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্ক তো চুকতেই বসেছে, দেখি তোকে পাওয়া যায় কিনা ?

—সেলসে আছিস ?

—হ্যাঁ।

—কি তৈরি হয় তোদের কোম্পানিতে ?

—ও সব কথা ছাড় তো। আর ভালো লাগে না। অন্য কিছু বল।

—মদ-টদ খাস ?

—একটু আধটু চলে।

—তবে চল আমার এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে নিয়ে যাই। ওখানে অনেক বিদেশী জিনিস আছে। সময়টা ভালোই কাটবে।

একটা ট্যাক্সি ডেকে সুবীর তপনকে শ্যামবাজার অঞ্চলে একটা ফ্ল্যাটে নিয়ে আসে। কলিংবেল টিপতেই ভেতরে আলো জ্বলে ওঠবার আভাস পাওয়া যায়। বেরিয়ে আসে দোহারা চেহারার এক বলিষ্ঠ যুবক। সুবীর তপনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। —আমার বন্ধু তমাল চক্রবর্তী। আর এ হচ্ছে তপন। কলেজের বন্ধু। এখন সেলস একজিকিউটিভ।

—আমি একজন সাধারণ সরকারী কর্মচারী। কাস্টমসে আছি। আপনি বসুন তপনবাবু। আমার রাঁধুনি ছুটিতে আছে। তাই নিজেই রান্নাবান্না করে নিচ্ছি। সুবীর, আয় আমাকে একটু সাহায্য করবি। ওরা দুজন রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। তপন বসে বসে ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা ওলটাতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে দুজনেই ঘরে ঢোকে। হাতে দামী হুইস্কির বোতল।

দীর্ঘায়ু কামনা করে ওরা তিনজনে গ্লাসে চুমুক দেয়। সুবীরের মুখখানা কেমন যেন থমথমে। তমাল বলতে থাকে—বুঝলেন তপনবাবু, কাস্টমসে কাজ করার এই একটা সুবিধা আছে। বহু জিনিস আমরা আটকে দিই। অন্যান্য জিনিসগুলো কিছুদিন পরে নীলাম ডাকা হয়। শুধু লিকারের বোতলগুলো আমরা সবাই ভাগ করে নিই। সুবীর মাঝে মাঝে বিলিতী মদ খাবার জন্যই আসে। আপনিও চলে আসবেন মাঝে মাঝে। সময়টা মন্দ কাটে না।

—নিশ্চয়ই আসবো।

তিনজনে এক সময় খোশগল্পে মেতে ওঠে। নানা রকম অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা হয়। তপন খুব হিসেব করে কথা বলে। নিজেকে যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। হাসি গল্পে সন্ধ্যেটা কেটে যায়। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তপন বলে—এবার আমাকে উঠতে হবে। চলি রে সুধীর। চলি তমালবাবু। খুব ভালো লাগলো আজকের সন্ধ্যেটা, মাঝে মাঝে এসে বিরক্ত করবো কিন্তু।

—খুব খুশি হবো। তমাল সৌজন্যের হাসিতে জবাব দেয়।

—আমি আর একটু থাকবো। তুই কিছু মনে করলি না তো তপন?

—আরে না না। কালকে যাবার তাড়া আছে বলে আমি উঠলাম। নইলে আমারও কি উঠতে ইচ্ছে করছিল?

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তপন শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ের দিকে হাঁটতে থাকে। সোজা ফ্ল্যাটে ফিরে যেতে হবে। হঠাৎ তপনের মনে হয় কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। পেছনে তাকাতেই দেখে হাত দশেক দূরে একটা লোক ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। তপন ফুটপাতে ওঠে। লোকটি কাছেই একটা সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়ায়। তপন বাস স্টপেজে দাঁড়ায়। লোকটিও একটা ব্যবধান রেখে দাঁড়ায়। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে তপন উঠে পড়ে। লোকটি নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকে। পেছনের উইণ্ড স্ক্রীন দিয়ে লোকটির দিকে একবার তাকিয়ে তপনের মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

॥ পনের ॥

টাইমপিসের এলার্মে ঘুম ভেঙে যায় তপনের। কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা। ছ'টা আটচল্লিশে ট্রেন। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে স্টোভে চায়ের জল চাপিয়ে দেয়। হঠাৎ মনে হয় চানটা করে গেলে কেমন হয়? পরক্ষণেই মনে পড়ে বারুইপুরের কথা। শহর-ঘেঁষা গ্রামখানা ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

ছোট একখানা আড়াই ঘরের বাড়ি। অবসর নেবার পর বাবা যা হাতে পেয়েছিলেন তাই দিয়ে তৈরি হয়েছিল বাড়িখানা। গৃহপ্রবেশের

দিন বাবার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছিল। অনেকদিন আগের কথা। তপন সবে স্কুল ফাইন্যাল পাস করেছে। মিলনের বয়েস পাঁচ কি ছয়। তপন জিজ্ঞাসা করেছিল—তুমি কাঁদছো কেন বাবা? বাবা চোখ মুছে জবাব দিয়েছিল, আজ তোর মায়ের কথা মনে পড়ছে তপু। গরিবের ঘরের মেয়ে। ইচ্ছে ছিল তার নিজের একখানা বাড়ি হবে। তাতে স্বামী ছেলেপুলে নিয়ে নিজের মতো সংসার করবে। তোর মায়ের চেষ্টাতেই এই একখণ্ড জমি কিনে রেখেছিলাম। আজ সবই হলো শুধু সে নেই। তপু, বাবা আমার, যেটুকু সাধ্য আমি করে গেলাম। এরপর তোরা তোদের ইচ্ছে মতো বাড়িয়ে নিস।

মাকে আজও স্পষ্ট মনে পড়ে তপনের। দারিদ্র্যের সাথে প্রতিদিন যুদ্ধ করতে হলেও মাকে কোনদিন মুখ ভার করে থাকতে দেখেনি। মিলন তখন এক বছরের। মাজা বাসনগুলো রাখতে গিয়ে মায়ের হাত থেকে ঝনঝন করে বাসনগুলো পড়ে গেল। নৈহাটির সেই বাড়িটা। ছুটে এলো অন্যান্য ভাড়াটেরা। বাবার সেদিন আর অফিস যাওয়া হলো না। তারপর বাবা অফিস জয়েন করেছিল একেবারে সব কাজ শেষ করে। হাসপাতালে তপনের মাথায় হাত রেখে বাবা বলেছিল—কাঁদিস না তপু। তুই তো বড়ছেলে! তোর তো অবুঝ হলে চলবে না।

সেই যে তপন চোখ মুছেছিল আর কাঁদেনি। মিলনটা মাঝে মাঝে কাঁদতো। তারপর নিজে থেকেই বুঝে নিয়েছিল, মা আর কোনদিন আসবে না। একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল বাবার মধ্যে। কোন কথা বলতো না কারও সাথে। আশেপাশের বৌ-ঝিরা কখন যেন আপন হয়ে গিয়েছিল। মিলনও আর দুষ্টুমী করতো না। কিছুদিন পরে বাবা মায়ের একটা বিরাট ছবি এনে ঘরে টাঙিয়ে দিয়েছিল। ছবিখানার দিকে তাকালে মনে হতো মা যেন এক্ষুনি কিছু বলবে। মিলনটা মাঝে মাঝে ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে অনর্গল কথা বলে যেতো। আর বাবা? হ্যাঁ, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বাবা নিঃশব্দে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতো। একদিন মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় তপন দেখেছিল ছবিটার দিকে চেয়ে বাবা অস্ফুট স্বরে বলছে—কেন তুমি আমাকে এভাবে শাস্তি দিলে? আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ওখানে আর কোনদিন যাবো না!

তপনের মাঝে মাঝে মনে হতো কিসের প্রতিজ্ঞা? বাবা কোথায় যাবে না বলেছিল? অনেক দিন আগের কথা। তবু একটা প্রশ্নের কাঁটা মাঝে মাঝে তপনকে খোঁচাতো।

কল থেকে বালতি উপচে জল পড়ছে। তপন কলটা বন্ধ করে দেয়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে সম্বিৎ ফিরে পায় তপন। টাওয়েল জড়ানো অবস্থায় দরজা খুলতেই দেখে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুধীর হালদার। সুধীরকে বসতে বলে আবার বাথরুমে ঢোকে তপন। বেরিয়ে এসে দেখে সুধীর ইতিমধ্যে চা তৈরি করে ফেলেছে। ধন্যবাদ জানিয়ে তপন জামা কাপড় পরতে থাকে।

ভোরবেলা বারুইপুরগামী ট্রেনের যাত্রীসংখ্যা খুবই সামান্য। কিছু অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তপন একটা সিগারেট ধরায়। ভোরের কাঁচা রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। হিমেল হাওয়ার ঝাপটা লাগে চোখে মুখে। ট্রেন ছুটে চলেছে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি। অনেকদিন পর বাড়ি যাচ্ছে তপন। দু'পাশে ফাঁকা মাঠ। ধান কাটা হয়ে গেছে। গোছা গোছা ধানের মোথা আকাশের দিকে চেয়ে আছে। একদিন এই পথে প্রাত্যহিক যাত্রী ছিল সে। সেদিনের তপনের সাথে আজকের তপনের অনেক তফাৎ।

—বাবু একটু আগুনটা দেবেন?

গ্রাম্য মানুষটার আবেদনে তপনের চিন্তায় ছেদ পড়ে। পকেট থেকে দেশলাইটা বার করে দেয়। পুরানো চিন্তা থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। না সে কিছু ভাববে না। এখন সে দু'চোখ ভরে সূর্যের আলো দেখবে। এত স্পষ্ট করে পৃথিবীটা সে অনেক দিন দেখেনি।

—নিন বাবু। দেশলাইটা ফেরত দেয় লোকটি। আবার দৃষ্টি যায় জানালার বাইরে। আম জাম কাঁঠাল গাছ ঘেরা ছোট গ্রাম। পুকুরপাড়ে ব্যস্ত গৃহবধূ। রেলগাড়ি দেখছে ন্যাংটো ছেলেটা। তপনের মনে হয় ওরা সব যেন এক নতুন জগতের বাসিন্দা। ওখানে কোন অপরাধের অন্ধকার নেই। দশটা দিনের ছুটি। সে মিশে যাবে গ্রাম্য মানুষের সঙ্গে। পুকুরে স্নান করবে। সারাগায়ে মেঠো পথের ধুলো মাখবে।

সুভাষগ্রামে গাড়ি থামে। আর দুটো স্টেশন পরেই বারুইপুর। সেই পরিচিত স্টেশন। সেই চায়ের স্টলটা কি এখনও আছে? চা খেতে খেতে

ট্রেন ছাড়বার সময় হলে মামুদা বলতো—যাও ট্রেনে ওঠো। ফেরার সময় দাম দিও। বাবার খবর অনেকদিন জানে না। মিলন নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে তপনকে দেখে। এবার মিলনের একটা বিয়ে দিতে হবে। বিয়ের কথা মনে হতেই তপনের আবার সেই অপরাধী জীবনের কথা মনে পড়ে।

বিয়ের নামে কি বিরাট এক প্রহসনের সাথে সে জড়িত। জানালার বাইরে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক দৃশ্য। তেমনি একের পর এক ছবি ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে তপনের মনে। ও আবার একটা সিগারেট ধরায়।

রেল লাইনের পাশে তারে লেজ ঝুলিয়ে বসে আছে একটা ফিঙে। মিলনকে ঘুম পাড়াবার সময় মা সুর করে গাইতো—আয়রে পাখি লেজ ঝোলা মিলনকে নিয়ে কর খেলা। মায়ের স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে পাখিটাকেও আপন মনে হয়।

ট্রেন বারুইপুর স্টেশনে এসে থামে। প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে প্রাত্যহিক যাত্রীরা। এই ট্রেনটাই আবার কলকাতায় ফিরে যাবে। প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে তপন একবার চারিদিকে চেয়ে দেখে। না, বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। শুধু শেডগুলোতে রূপোলী রং করা হয়েছে। তপন আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। ঐ তো সেই চায়ের স্টলটা। মামুদা তেমনি ব্যস্ত। এতক্ষণে যেন তপন একটি চেনা মুখ দেখতে পায়।

—একটা চা দেখি। তপন স্টল ঘেঁষে দাঁড়ায়।

মামুদা তিনটে কাপের সাথে আরও একটা কাপ জুড়ে দেয়। তপন দেখে কত বুড়ো হয়ে গেছে মামুদা। তপনের দিকে একবারও তাকাচ্ছে না। মামুদার সেই মেয়েটা কই! মাঝে মাঝে যে খদ্দেরের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতো? লাল ফ্রক পরে বাবার গা ঘেষে দাঁড়িয়ে থাকতো। এতদিনে নিশ্চয় তার বিয়ে হয়ে গেছে। কি যেন নামটা? অনেক ভেবেও তপন নামটা মনে করতে পারে না।

—চা নিন। চায়ের কাপটা এগিয়ে দেয় মামুদা। কিন্তু তপনের মুখের দিকে তাকায় না। অন্যান্য খদ্দেরদের দিকে কাপগুলো এগিয়ে দেয়। পিছনের সেই কাঁচের আলমারিটা ধোঁয়া লেগে লেগে কালো হয়ে গেছে। ভেতরের কোন জিনিস আর বাইরে থেকে দেখা যায় না। তপন চায়ের সাথে একটা সিগারেট ধরায়। ট্রেনের হুইসেল দেয়। যাত্রীরা

তাড়াতাড়ি পয়সা দিয়ে ট্রেনের দিকে ছোটে। স্টলটা এক মিনিটেই ফাঁকা হয়ে যায়।

—মানুদা, কেমন আছ গো ?

চমকে ওঠে মানুদা। ঘষা কাঁচের দৃষ্টি নিয়ে তাকায় তপনের দিকে। অসহায় চাহনি। অবসন্ন তিক্ততা।

—আমি তপন গো। কলেজে পড়ার সময় তোমার দোকান থেকে রোজ চা খেতাম মনে নেই ?

মানুদার চোখে মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে ওঠে। চায়ের কাপগুলো সরাতে সরাতে বলে, তোমাদের সে যুগ আর নেই ভাই। আজও কলেজের ছেলেরা এখানে চা খায়। তারা দুটোকে তিনটে করে কিংবা তিনটেকে চারটে। তারপর অনেক সময় পয়সা না দিয়েই চলে যায়। চাইলে দোকান তুলে দেবার ভয় দেখায়। তোমাদের সময় মস্তান বলে কোন কথা ছিল ? এখন হয়েছে। ওদের সারাদিনের আড্ডার জায়গা হচ্ছে এই স্টেশন প্ল্যাটফর্ম। ধারে চা খাবে তারপর……হঠাৎ চুপ করে যায় মানুদা। একদা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে—থাক ওসব কথা। তুমি কি করছো এখন ?

—চাকরি।

—কলকাতাতেই থাকো ?

—হ্যাঁ। এই নাও পয়সা। তপন পয়সা এগিয়ে দেয়।

—ওটা থাক ভাই। বারো-চোদ্দ বছরের পুরানো ডাকটা শুনে তোমাকে খুব আপন মনে হলো। বাড়িতে গেলেও তো লোকে এক কাপ চা খাওয়ায়। তা কতদিন আছো ?

—দিন দশেক।

—সময় পেলে মাঝে মাঝে এসো। একটু সুখ-দুঃখের কথা বলবো।

তপন ওভারব্রীজের দিকে হাঁটতে থাকে। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ওটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দুর শালা! স্টেশনে নেমেই মনটা কেমন দুঃখু দুঃখু লাগছে। ওভারব্রীজের উপর খানিকক্ষণ দাঁড়ায় তপন। হিম হিম হাওয়াটা দারুণ ভালো লাগছে। লেভেল ক্রসিংএর সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো রিকশা। সবাই ডাকছে তপনকে। রিকশায় ওঠবার কথা ভেবেও তপন হাঁটতে থাকে। কতক্ষণই বা! মাত্র

দশ বারো মিনিটের পথ। হাঁটতে হাঁটতে দু'পাশে তাকায় তপন। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চায়ের দোকান, সেলুন, পান-বিড়ির দোকানে রাস্তার দুপাশে আর খালি জায়গা নেই।

—তপু না! পাশ থেকে নিজের নামটা কানে আসতেই ফিরে চায় তপন। অলক। একসঙ্গে স্কুলে পড়তো। ধুতি শার্ট পরা। হাতে বাজারের ব্যাগ।

—কেমন আছিস অলক?

—তুই শালা কলকাতায় গিয়ে একেবারে ক্যালকেশিয়ান হয়ে গেছিস। আমাদের কথা বেমালুম ভুলে গেছিস মনে হচ্ছে?

—ভুললে কি আর আসতাম? বারুইপুর থেকে কলকাতায় চাকরির সন্ধান করার চেয়ে ওখানে থেকে চেষ্টা করাই ভালো মনে হলো। তাই অনেকদিন আসতে পারিনি। তপন কৈফিয়তের সুরে বলে।

—কলকাতা থেকে বারুইপুর কতদিনের পথ, যে বছরে একবারও আসতে পারিস না? আসলে শহরের মধু পেলে কেউ আর গ্রামে আসতে চায় না। চাকরি যে পেয়েছিস তা চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। মেয়েছেলের পাল্লায় পড়েছিস কিনা বল তো?

—চল চল, কোন চায়ের দোকানে বসে কথা বলি। তুই বিয়ে করেছিস?

এতক্ষণে অলক যেন একটা মনের মতো কথা শুনতে পেলো। হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করে—তোর কি মনে হয়?

—তোর খুশি খুশি ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে করেছিস।

—তপু, এখানে চা না খেয়ে চল আমার বাড়িতে। চা-ও খাওয়া হবে সেই সাথে আমার বৌ-এর সাথেও তোর আলাপ হয়ে যাবে।

—শোন অলক, অনেকদিন পর এলাম। আগে বাড়ি যাই। বিকেলে বরং তোর বাড়ি যাবো। দিন দশেক থাকবো। তোর ওখানেই আড্ডা দেবো। যাই হোক, তুই কি করছিস বললি না তো?

—এম. এ. পাস করে মাস্টারী করছি। ও সব কথা যাক, তুই বিকেলে আসছিস তো?

—নিশ্চয়ই।

—তখন কথা হবে। চলি।

অলক চলে যায়। সেদিকে তাকিয়ে তপন একটু হাসে।

॥ ষোল ॥

ডাঃ সান্যালের সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে ফিরে এসেছে সুধীর হালদার। ওর সামনে বসে আছে মিঃ বোহরা এবং শান্ত। ওরা দুজনেই মন দিয়ে সুধীর হালদারের কথা শোনে। মিঃ বোহরা বলেন—সব ঠিকঠাক আছে। পায়রা পোষ মানা। শুধু ডাঃ সান্যালের খোপ থেকে আমাদের খোপে আনতে হবে। তবে শান্ত, তোমাকে খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে। মনে রেখো প্রতিপক্ষ হিসাবে ডাঃ সান্যাল যথেষ্ট শক্তিশালী।

—আপনি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন মিঃ বোহরা। শান্ত ঋজুস্বরে বলে।

—ঠিক আছে, তাহলে আগামী কাল থেকেই তুমি কাজ আরম্ভ করে দাও। একটু সময় লাগুক আপত্তি নেই, কিন্তু কোন ভুল যেন না হয়। সুধীরের স্টাডি মনে হচ্ছে ঠিকই। একদিকে স্বামী হারানোর ব্যথা যেমন গভীর, অন্যদিকে আর একটি স্বামী পাওয়ার স্বপ্ন ওকে বিভোর রাখে. তোমার ভূমিকা হবে সমব্যথীর মতো। ওর ব্যথা যেন তুমি সহ্য করতে পারছো না। নিজের বিয়ের কথা ভাববার সময় তোমার নেই। চাকরিতে উন্নতি করাই তোমার লক্ষ্য। তারপর আস্তে আস্তে বেলার সিকিউরিটির জন্যই যেন টাকা পয়সার দরকার এইভাবে ওর মনের কাছাকাছি আসতে থাকবে, তারপর ··

শান্ত অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে মিঃ বোহরার দিকে। কত ঠাণ্ডা মাথায় একটা লোক একটি মেয়ের সর্বস্ব ছিনিয়ে নেবার কথা ভাবছে। মিঃ বোহরার কথা শেষ হয়। শান্ত ঠাণ্ডা গলায় বলে—তাহলে আজ আমি উঠি স্যার। কালকেই আমি মাঝদিয়া রওনা হচ্ছি।

—উইশ ইউ গুড লাক্। মিঃ বোহরা হাত বাড়িয়ে দেন।

শান্ত হাসিমুখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

সুধীর হালদার এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। মিঃ বোহরা ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—কি সুধীর, সব ঠিক আছে তো?

সুধীর চট করে কোন জবাব দেয় না। ভেবে চিন্তে আস্তে আস্তে বলে—আমার একটা কথা মনে হচ্ছে স্যার। এ ব্যবসাটা এবার আস্তে আস্তে গোটাতে থাকুন। অনেকগুলো কেস হয়ে গেছে। যত বেশী

এগোবেন, ততো বেশী রিস্ক্। একবার পুলিসের নজরে এসে গেলে মুশকিল।

সুধীরের কথা শুনে মিঃ বোহরার অভিব্যক্তির পরিবর্তন হয়। গম্ভীর হয়ে চুরুটে টান দিতে থাকেন।—ঠিক আছে, তোমার কথাই রইলো। শাস্ত আর তপনের কাজ দুটো শেষ হয়ে গেলেই আমাদের এ ব্যবসার গণেশ ওলটাবে। চিন্তান্বিত মুখে মিঃ বোহরা উঠে দাঁড়ান।

—স্যার আমাকে কিছু টাকা দিতে পারেন! বিশেষ দরকার।

—কত?

—শ' পাঁচেক!

—আচ্ছা তুমি ওপরে এসো। আমি দেখছি।

টাকা নিয়ে সুধীর ফিরে আসে কলুটোলার সেই ছোট্ট ঘরখানায়। মকবুল বেরোবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। সুধীরকে দেখে বলে—তুই এসেছিস ভালোই হয়েছে। আমি বোধহয় দিন দুয়েক আসতে পারবো না। বর্ডারে এখন দারুণ কড়াকাড়ি। অথচ এখনই কাজ বেশী। পরশুদিন দুপুরে ফিরবো।

সুধীর কোন কথা না বলে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—কিরে শালা, নতুন বৌয়ের মতো হাঁ করে কি দেখছিস?

—বিয়ের পর তোর বউ তোর দিকে এইভাবে তাকাতো বুঝি?

মকবুল এ কথার কোন জবাব দেয় না। ভাঙ্গা আয়নায় চোখ রেখে চুল আঁচড়াতে থাকে। যাবার সময় শুধু বলে যায়—বিয়ে তো করলি না শালা, বৌয়ের মর্ম তুই কি বুঝবি!

সুধীর ওর চলে যাবার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

মকবুল বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর সুধীরও বেরিয়ে পড়ে। একটা চায়ের দোকানে বসে চা খায়। সেণ্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক যানবাহন চলেছে। বাস, ট্যাক্সি, মিনিবাস। এক বিরাট মিছিল। চায়ের দোকানেই সময় কাটায়। সন্ধ্যে পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। সোনাগাছিতে এখন সাজের ঘটা চলছে। মাগীগুলো পুরুষ ভোলানোর জন্য মুখে রং আর চোখে কাজল টানছে। রোকেয়াও সাজছে। সাজুক। ওর ধবধবে ফর্সা মুখে লালচে রং সত্যিই মন ভোলায়। রোকেয়া কাজলের বদলে সুরমা দেয়। ওতে নাকি চোখ

ভালো থাকে। তা শালা শরীরটা নিজেই যদি বারো ভাতারে ঘাঁটে তো শুধু চোখ ভালো রেখে কি হবে? মকবুল শালার বরাতটাই খারাপ। অত সুন্দরী বৌ পেয়েও ভোগে লাগলো না। তবে রোকেয়ার কথা ও ভাবে, কোন সন্দেহ নেই। ভাগ্যিস মকবুল সোনাগাছিতে যায় না। গেলে একদিন না একদিন নিশ্চয়ই দেখা হতো রোকেয়ার সাথে। তারপর? মকবুল কি রোকেয়াকে ঘরে তুলতো?...

চায়ের দোকানে একটু একটু করে ভিড় জমতে থাকে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সুধীর আস্তে আস্তে সেণ্ট্রাল এভিনিউ ধরে হাঁটতে থাকে।

সোনাগাছিতে ঢোকবার মুখে আলোটা আজ জ্বলেনি। গলিটা বেশ অন্ধকার। দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েরা এ ওর সাথে কথা বলছে। ওদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গলির মুখে। এবার বাঁয়ে ঘোরে সুধীর। আর খানিকটা এগোলেই রোকেয়ার ঘর। সুধীর মনে মনে ভাবে আজ নিশ্চয়ই রোকেয়া সেই লাল শাড়িটা পরেছে। অবশ্য আজকে যে সুধীর আসবে রোকেয়া জানে না।

দরজা খোলা। কেউ দাঁড়িয়ে নেই। তার মানে আজ বাজার ভালো। সবাই খদ্দের পেয়ে গেছে। রোকেয়ার ঘরেও নিশ্চয়ই লোক আছে। সুধীরকে অপেক্ষা করতে হবে। আজ কিছুদিন যাবৎ রোকেয়ার ঘরে অন্য লোক সুধীর কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। কোথায় যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। নিজের মনেই খিস্তি দেয় রোকেয়াকে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় রোকেয়ার ঘরের দিকে। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। সুধীরকে দেখে মাসী তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে। মুখ ঝামটা দিয়ে বলে—এই যে রসের নাগর, পিরীতের নাং, মাগীর যে মরার দশা হয়েছে খোঁজ রাখ? তুমি তো শুনেছি ওর দেশের নোক। তা দেশের নোক মানে কি শুধু রাত্রে শোওয়ার সম্পর্ক? আমার হয়েছে জ্বালা।

—কি হয়েছে মাসী?

—কি আবার হবে? পোয়াতি ছিল কাউকে বলেনি। আমি তো বাতের ব্যথায় নড়তেই পারি না। তা মাগী অন্য কাউকেও কিছু বলেনি। কাল রাত থেকে রক্তস্রাব আরম্ভ হয়েছে। এখনও বন্ধ হয়নি। ডাক্তার দেখছে। তুমি ভেতরে যাও। ডাক্তার কি বলে শোন।

সুধীর ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢোকে। মড়ার মতো পড়ে আছে

রোকেয়া। ডাক্তার ইঞ্জেকশন দেয়। ওষুধ লিখে সুধীরের হাতে দিয়ে বলে—এক্ষুণি নিয়ে আসুন। পেসেণ্টকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আপনি মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে আসুন আমি ভর্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সুধীর প্রেসক্রিপশন নিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। নিয়ম মতো ওষুধ খাইয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সোনাগাছিতে ট্যাক্সির অভাব হয় না। ধরাধরি করে ট্যাক্সিতে তুলে সুধীর মেডিকেল কলেজে এসে পৌঁছোয়। স্ট্রেচারে করে যখন রোকেয়াকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে তখন একবার ও চোখ খুললো। কোন কথা বলতে পারলো না। সুধীরের চোখের সামনে স্ট্রেচারটা আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সোনাগাছিতে ফিরে আসে সুধীর। ইতিমধ্যে ঘরে ঘরে খদ্দের ঢুকে গেছে। সিঁড়িতে বসে হাই তুলছে পাখি। সুধীর একবার ওর দিকে তাকায়। আস্তে আস্তে বলে—চলো ঘরে চলো।

পাখির মুখে না হাসি না কান্নার এক মিশ্র অভিব্যক্তি। পাখি সুধীরকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। এবার যেন ওর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

—মাল চলবে ?

—আমি তো মাল খাই না পাখি।

—তা ঘণ্টা হিসেবে থাকবে না সারারাত ?

—আপাততঃ ঘণ্টা দুয়েক আছি। আচ্ছা, ওর কি হয়েছিল বলো তো ?

পাখি বড় আয়নায়.নিজেকে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দেখে। তারপর হঠাৎ ঘুরে বলে—ঘরের বউ লাইনে নামলে কি হয় জানেন ? ঘরের কথাও ভুলতে পারে না, আবার লাইনের কথাও ভাবতে পারে না। ওর পেটে বাচ্চা আপনি জানতেন না ?

—বিশ্বাস কর পাখি, ও আমাকে কিছুই বলেনি।

—ওই বাচ্চার বাপ ছিলেন আপনি। আমাকে বলতে বারণ করেছিল বলে আমি কাউকে বলিনি। মা হবার খুব শখ ছিল ওর।

সুধীর উঠে দাঁড়ায়। ঘণ্টা হিসেবে চল্লিশটা টাকা পাখির টেবিলে রেখে ও বেরিয়ে পড়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হয় কলুটোলার সেই

ঘরখানায়। নিস্তব্ধ ঘরে পাখির কথাগুলো বার বার মনে পড়ে "ওই বাচ্চার বাপ ছিলেন আপনি।"

বিছানার ওপর চোখ পড়ে। মকবুলের ভিজে বালিশ। নির্জীবের মতো পড়ে আছে লুঙ্গিটা। মকবুলকে একবার খবর দেওয়া দরকার। অন্ততঃ শেষ বারের মতো রোকেয়াকে দেখুক। পরক্ষণেই মনে পড়ে, মকবুল দু'দিনের মধ্যে আসবে না। যদি রোকেয়ার ভালোমন্দ কিছু হয়, মকবুলের পাশে শুয়ে সুধীর কিছুতেই চেপে রাখতে পারবে না। ও জায়গা না দিলে আজ সুধীর কোথায় থাকতো? ভিজে বালিশটায় হাত পড়তেই চমকে ওঠে সুধীর। কাল রাতেও মকবুল কেঁদেছে।

এক অপ্রতিরোধ্য মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে সুধীর। একদিকে রোকেয়ার বারণ অন্যদিকে মকবুলের ভেজা বালিশ। দূর শালা, মাথায় কিছু আসছে না। আপাততঃ মকবুল ফিরে না আসা পর্যন্ত রোকেয়াকে বাঁচিয়ে তোলার কথাই ভাবতে হবে। টাকা যা আছে কিছুদিন চলবে। তারপর আবার না হয় মিঃ বোহরাকে বলা যাবে। রাতে একটু ঘুমুনো দরকার। সকাল হলেই আবার হাসপাতালে যেতে হবে। কেমন আছে রোকেয়া! বাঁচবে তো! আবার পাখির কথা মনে পড়ে—"ওই বাচ্চার বাপ ছিলেন আপনি।"

বড় রাস্তা দিয়ে একটা ট্রাক চলে যায়। আওয়াজ কানে এসে লাগে। ঘুম আসছে না। সুধীর ভাবতে থাকে, দূর শালা, রোকেয়ার সাথে দেখা না হলেই ভালো হতো। কোন দায়িত্ব থাকতো না। আর পাঁচটা পুরুষের মতো যেতো, টাকা ফেলতো মজা লুটতো। এ শালা জানাশোনা হয়ে বিপদ হয়ে গেছে। সোনাগাছির কত মেয়েই তো কত রকম রোগে মারা যায়। কোন পুরুষের কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু রোকেয়া কি কখনও সুধীরের কথা বলেছে? না হলে মাসীই বা অত মুখ ঝামটা দিয়ে কথা বলবে কেন? পরক্ষণেই মনে হয় সুধীর নিজেই বা কিসের টানে রোকেয়ার ঘরেই যেতো? কিসের টানে প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধ আনতে ছুটেছিল? কেন ট্যাক্সি ডেকে ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দিলো? কেনই বা কাল সকালে রোকেয়াকে দেখতে যাবার জন্য মনটা হাঁকপাঁক করছে? কেন? কেন? আবার পাখির মুখখানা ভেসে ওঠে—"ওই বাচ্চার বাপ ছিলেন আপনি।"

॥ সতের ॥

সকালে ঘুম ভাঙতেই সুধীর ধড়মড় করে উঠে বসে। হাতঘড়িটা বালিশের তলা থেকে বার করতে গিয়ে বালিশটাকে ভিজে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে রোকেয়ার দুটো বোজা চোখ একটুখানি খুললো। আবার বুজে গেল। ছুটতে ছুটতে হাজির হয় হাসপাতালে। খুঁজে বার করে ডাক্তারবাবুকে।

—রোগী কেমন আছে স্যার?

সুধীরকে একবার ভালো করে দেখেন ডাক্তারবাবু।—সতের নম্বর পেসেণ্ট তো? শুনুন, অপারেশন করতে হবে। রক্ত চাই। এখন কিন্তু টাকা দিলে রক্ত পাওয়া যাবে না। ডোনেট করতে হবে, পারবেন তো? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তারবাবু আবার প্রশ্ন করেন—কি হয়েছিল বলুন তো? প্রশ্নটা করেই ডাক্তারবাবু কি যেন ভাবেন। তারপর নিজের মনেই বলেন, সরি, এ তো ডাঃ সেনের পেসেণ্ট। যাই হোক রক্ত যোগাড় করতে পারবেন তো?

—নিশ্চয়ই পারবো ডাক্তারবাবু।

—কতদিনের আলাপ আপনার সঙ্গে?

—অনেক দিনের। আমরা এক গাঁয়েই থাকতাম।

—আপনাদের পুলিসে দেওয়া উচিত। গ্রামে প্রেম করবেন আর শহরের লোভ দেখিয়ে সোনাগাছিতে এনে তুলবেন। আপনারা মানুষ না জানোয়ার?

সুধীর কোন জবাব দেয় না। এক গাঁয়ের লোক শুনে ডাক্তারবাবু ভুল বুঝেছেন। পায়ে পায়ে সুধীর বাইরে বেরিয়ে আসে। ব্লাড ব্যাঙ্কের সামনে বিরাট লাইন। এদের সবারই কি মৃতপ্রায় রোগী আছে? লাইনের শেষ লোকটির পেছনে এসে দাঁড়ায় সুধীর। কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করে—এটা কিসের লাইন?

—রক্ত দেবার। এক বোতল রক্ত দিলে কুড়ি টাকা। সঙ্গে অনেক খাবার।

—আপনার কি রোগী আছে?

—আজ্ঞে না। আমরা টাকার জন্য রক্ত দিই। কুড়ি টাকা আর অনেক খাবার।

একটু চা খেতে হবে। সকালে উঠে চা খাওয়া হয়নি। লোকটির পেছনে লাইন রেখে সুধীর একটা চায়ের দোকানের দিকে এগিয়ে যায়। চায়ে একটা চুমুক দিয়েই মনে হয়। তাই তো, লোকটাকে যদি নগদ পঁচিশ টাকা আর কিছু খাবার দেওয়া যায় তবে রক্তটা তো সে-ও কিনতে পারে।

কোন রকমে চা শেষ করে সুধীর আবার লোকটির কাছে ফিরে আসে। কোন ভূমিকা না করে বলে—আমার পেসেণ্ট আছে ভেতরে। অনেক রক্ত লাগবে। তোমাকে আমি পঁচিশ টাকা করে দেব আর সঙ্গে খাবার। রক্তের কার্ডটা তুমি আমাকে দেবে। তোমার সঙ্গে ক'জন লোক আছে ?

—আজ্ঞে চারজন। আপনার কি সবটাই চাই।

—হ্যাঁ।

—তাহলে এক কাজ করুন। আপনি রক্তের জন্য পঁচিশ আর দু' টাকা করে আমাদের বখশিস দেবেন।

—তাই দেবো। কতক্ষণ লাগবে সব কাজ শেষ হতে ?

—একসঙ্গে চারজন করে দেয়। আপনি এক ঘণ্টা পরে আসবেন। আমরা সিঁড়ির কাছে বসে থাকবো।

সুধীর লোকটিকে একটা বিড়ি খাওয়ায়। লোকটি পরমানন্দে লাইনে গিয়ে দাঁড়ায়।

ঘণ্টাখানেক এদিক ওদিক কাটিয়ে সুধীর ফিরে আসে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চত্বরে। নির্দিষ্ট সিঁড়ির ছায়ায় বসে আছে চারটে মানুষ। সুধীর এগিয়ে যেতেই ওরা চোখ মেলে তাকায়। ক্লান্ত দৃষ্টি নিয়ে চারখানা কার্ড এগিয়ে দেয় ওরা। সুধীর টাকা গুনে দিয়ে চলতে থাকে কলুটোলার দিকে। বুক পকেটে চারখানা কার্ড। মানে চার বোতল রক্ত। সুধীর নিজেও এক বোতল দিতে পারবে। রোকেয়াকে যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে। ওর সাথে একবার দেখা করতে হবে। কিন্তু বিকেল চারটের আগে দেখা করা যাবে না। রোকেয়া কি কথা বলতে পারবে ? পারলে কি বলবে ?

কলুটোলার সেই ঘর। দড়িতে মকবুলের জামাটা ঝুলছে। জামাটার গায় হাত দেয় সুধীর। নিজের মনেই বলে, তাড়াতাড়ি ফিরে আয়

মকবুল, তোর বিবি ····· তাড়াতাড়ি স্নান সেরে হোটেলে খেয়ে ঘরে ফিরে আসতেই দু' চোখ ঘুমে ভেঙ্গে আসে। সুধীর শুয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙতেই হাতঘড়িটার দিকে তাকায়, চারটে বেজে গেছে· সুধীর হাসপাতালের দিকে ছুটতে থাকে। ফিমেল ওয়ার্ড। সতের নম্বর বেড। রোকেয়ার বিছানার কাছে এসে দেখে চোখ বুজে শুয়ে আছে রোকেয়া। সুধীর নিঃশব্দে পাশে রাখা টুলটায় বসে। ডাকবে কি ডাকবে না ভাবতে থাকে। চারিদিকে তাকায়। বিভিন্ন রোগীর আত্মীয়স্বজনেরা গল্প করছে। চারটে থেকে ছ'টা মাত্র দেখা করার সময়। কেউ সময় নষ্ট করতে রাজী নয়।

—তুমি কখন এলে গো? ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজে সুধীর চোখ ফেরায়। রোকেয়া তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

—এই তো কিছুক্ষণ আগে। সুধীর রোকেয়ার কপালে হাত রাখে।

—আমাকে হাসপাতালে তুমি এনেছো না গো?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে তুমি জানাওনি কেন রোকেয়া? আমি পাখির মুখ থেকে শুনলাম।

—ভেবেছিলাম তোমাকে অবাক্ করে দেবো। আবার ভাবলাম আমি তো লাইনের মেয়েমানুষ, তুমি আবার বিশ্বাস করবে কি না! হ্যাঁগো, ডাক্তার কি বলেছে বলো না! আমার বাচ্চা বাঁচবে তো?

—নিশ্চয়ই। তুমি বাঁচবে, তোমার বাচ্চা বাঁচবে। দেখো সব ঠিক হায়ে যাবে।

রোকেয়া হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কি যেন ভাবতে থাকে। কিছুক্ষণ পর ক্ষীণ কণ্ঠে বলে—শোন, আমি যদি মরে যাই, তোমার বন্ধুকে একটা খবর দিও। আমার কবরে ও যেন এক মুঠো মাটি দেয়, আর যদি বেঁচে উঠি, তুমি আমাকে লাইন থেকে নিয়ে এসো। আমি তোমার কাছে থাকবো।

সুধীর মাথায় হাত বোলাতে থাকে। রোকেয়া চোখ বোজে। সুধীর আস্তে আস্তে বলে—আমি তোমার জন্য কিছু ফল কিনে আনি। আচ্ছা, তোমার কি হয়েছিল বললে না তো? হঠাৎ ওরকম হলই বা কি করে?

রোকেয়া চোখ মেলে। ওর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামছে। সুধীর চোখ মুছিয়ে দেয়।

—তুমি তো আমার জ্বর দেখে গেলে। তারপর ক্রমেই জ্বর বাড়তে লাগলো। আমি প্রায় বেহুঁশ। দুপুর বেলা দারুণ জল তেষ্টা পেল। সবাই ঘুমুচ্ছে। সোনাগাছিতে দুপুরেই সবাই রাতের ঘুম ঘুমোয়। তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। কি করি, নিজেই উঠলাম। কাঁপতে কাঁপতে কলসী থেকে জল গড়িয়ে খেলাম। তক্তপোশে ফিরে আসবার সময় হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল। পড়ে গেলাম। তক্তপোশের কোণাটা লাগলো তলপেটে। তারপর আর কিছু জানি না। যখন একটু জ্ঞান হল, শুনলাম, আমার খুব রক্তপাত হয়েছে। হ্যাঁ গো, আমার বাচ্চা বাঁচবে তো?

—বলছি তো সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি শুয়ে থাকো। আমি তোমার জন্য কিছু ফল কিনে আনি।

সুধীর ফল কিনে আনার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘণ্টা পড়ে। ভিজিটারেরা একে একে উঠতে থাকে।

—কালকে আবার এসো। রোকেয়ার চোখে করুণ চাহনি।

সুধীর বলে—আসবো।

ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে সুধীর ডাক্তারবাবুর সাথে দেখা করে। জিজ্ঞাসা করে—স্যার, অপারেশন কি করতেই হবে? অবশ্য আমি চার বোতল রক্তের ব্যবস্থা করেছি। দরকার হলে আমি নিজেও এক বোতল দেবো।

—হ্যাঁ। কেন না ভেতরে বাচ্চাটা মারা গেছে বলে মনে হচ্ছে। তবে রক্তস্রাবটা আগে বন্ধ করতে হবে।

সুধীর স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে ডাক্তারবাবুর দিকে। ডাক্তারবাবু একবার ওর দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন—ভালই হয়েছে। কি জানেন, পতিতার গর্ভে যে শিশু জন্মায় সে তো দুর্ভাগ্য নিয়েই জন্মায়। পরিচয়-হীন এক শিশু। সমাজের আবর্জনার মতো বড় হয়ে উঠবে। ছেলে হলে গুণ্ডা কিংবা পকেটমার হবে। আর মেয়ে হলে···

—তাহলে স্যার আমি কালকে এসে খোঁজ নিয়ে যাবো? ডাক্তার-বাবুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সুধীর বলে ওঠে।

ডাক্তারবাবু বোধহয় অসন্তুষ্ট হন। বিরক্তভরা গলায় বলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, কালকেই আসবেন।

সুধীর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসে। কাল দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মকবুল ফিরবে। ওকে সব কথা খুলে বলতে হবে। এও বলবে জেনেও সে বলতে পারেনি। রোকেয়ার বারণ ছিল। তারপর ভিজিটিং আওয়ারে মকবুলকে নিয়েই সে যাবে। রোকেয়া যাই ভাবুক। এক্ষুনি কলুটোলায় ফিরতে ইচ্ছে করে না। কলেজ স্কোয়ারের একটা বেঞ্চে বসে সাত পাঁচ ভাবতে থাকে সুধীর। এক সময় লক্ষ্য করে আশপাশের লোকেরা সব চলে গেছে। খাঁ খাঁ করছে কলেজ স্কোয়ার। সুধীর উঠে পড়ে। হাতঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখে বারোটা বাজে।

কলুটোলার ছোট্ট ঘরখানায় সুধীর শুয়ে জেগে থাকে। ঘুম আসছে না। মকবুলের বালিশটা টেনে নেয়। বুক ঠেলে কান্না আসছে সুধীরের। অথচ কেন আসছে কিছুই বুঝতে পারে না।

ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে আবার চলে আসে হাসপাতালে। সেই লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। সুধীরকে দেখেই এগিয়ে আসে। একগাল হেসে বলে—বাবু আরও চারজন এনেছি। আপনি বলেছিলেন আপনার আরও রক্ত দরকার!

—হ্যাঁ। ওদের লাইনে দাঁড় করিয়ে দাও। আমি ঘুরে আসছি।

সুধীর বাইরে এসে চা টোস্ট খেয়ে খানিকক্ষণ সময় কাটিয়ে আবার ফিরে যায়। আরও চারখানা কার্ড ওর পকেটে আসে। তার মানে আরও চার বোতল রক্ত। রোকেয়াকে বাঁচাতেই হবে। হঠাৎ মনে পড়ে, "বেঁচে গেলে আমি তোমার কাছে থাকবো। তোমার ঘরে।" মকবুল? না তাহলে মকবুলকে সে কিছু জানাবে না। রোকেয়াকে নিয়ে আলাদা ঘর বাঁধবে। একটা বাচ্চা মারা গেছে। রোকেয়া, আমি বলছি তুমি আবার মা হবে।

ঘরে ফিরে এক অদ্ভুত আনন্দ পায় সুধীর। মকবুলের কথা ভাবতে গিয়েও ভাবতে পারে না। রোকেয়ার হাসিখুশী মুখখানা বার বার ভেসে ওঠে মনের আনাচে কানাচে। ঘর বাঁধার স্বপ্নে সুধীর বিভোর হয়ে থাকে। পরক্ষণেই মনে হয় দুপুরে মকবুল না এলেই ভালো হয়। তবু অপেক্ষা করে সুধীর। স্নান সেরে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকার পরেও মকবুল এলো না। সুধীর উঠে পড়ে। খিদেটা বড্ড চাগাড় দিয়ে উঠেছে।

চারিদিকে পরিচিত জামা কাপড়। তেলচিটে বালিশ, বিছানা। আর চোখের সামনে ভাসতে থাকে একখানা মুখ। গুনগুন করে ওঠে একটা কথা—"হ্যাঁ গো আমার বাচ্চা বাঁচবে তো?" ভাবতে ভাবতে সুধীর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙতেই হাতঘড়ির দিকে তাকায়। সাড়ে তিনটে বাজে। খিদেটা মরে গেছে। মকবুল আসেনি। নিজের মনেই সুধীর বলে—দূর্ শালা। বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। চায়ের দোকানে বসে ধীরেসুস্থে চা খায়। আজ আর দেরি হবে না। কিছুক্ষণ পরেই ও গিয়ে বসবে রোকেয়ার পাশে। তারপর··· মকবুল শালা না এসে ভালই করেছে। একদিকে রোকেয়ার বারণ, অন্যদিকে বন্ধু হিসাবে সুধীরের কর্তব্য। সুধীর কিছু ফল কিনে নেয়। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলে ফিমেল ওয়ার্ডের সতের নম্বর বেডের দিকে।

সারবন্দী বেডগুলো পেরিয়ে যেতেই চোখে পড়ে চারকোণা ঘরের মতো পর্দা দিয়ে ঘেরা সতের নম্বর বেড। তবে কি অপারেশন হয়ে গেছে? সুধীর ফল হাতে নিয়ে পর্দাঘেরা বেডের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। আশেপাশের বেডের ভিজিটারেরা কেমন কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায়। সুধীর বুঝতে পারে না ও কি করবে। পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢোকে। রোকেয়ার শরীরটা একটা সাদা কাপড়ে আগাপাশতলা বাঁধা। ছ্যাঁৎ করে ওঠে সুধীরের বুকখানা। বেরোবার জন্য পেছন ফিরতেই দেখে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন সিস্টার। চোখাচোখি হতেই সিস্টার বলে—বেলা আড়াইটার সময় মারা গেছে। আপনি অন ডিউটি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করুন।

নিঃশব্দে একবার সাদা কাপড়ে মোড়া রোকেয়ার দিকে তাকিয়ে সিস্টারকে অনুসরণ করে সুধীর।

আপেলের ঠোঙাটা সিস্টারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—কোন গরিব রোগীকে দিয়ে দেবেন। অন ডিউটি ডাক্তারের কাছে সুধীরকে পৌঁছে দিয়ে সিস্টার বিদায় নেয়।

—আপনি এসেছেন ভালোই হয়েছে। ডেথ সার্টিফিকেট সই করা আছে। তাড়াতাড়ি লাশ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। ডাক্তারবাবু আবার নিজের কাজে মন দেন।

—স্যার, বলছিলাম পেসেণ্ট আমার বন্ধুর স্ত্রী। আমার বন্ধুকে একবার খবর দিতে চাই। লাশ কালকে নিলে আপনাদের অসুবিধা হবে?

—অসুবিধে কিছু নেই। ঠাণ্ডা ঘরে আমরা দুদিন রাখবো। তারপর না নিলে বেওয়ারিশ মড়ার গাদায় চলে যাবে।

সুধীর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসে। যে মকবুলকে এতক্ষণ অন্তরায় মনে হচ্ছিল এখন তাকেই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। মৃত্যুর আগে যে রোকেয়াকে নিয়ে সে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখছিল মৃত্যুর পর সেই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কি করবে সুধীর? কলেজ স্কোয়ার সামনে। এক কোণে একটা বেঞ্চে এসে বসে। বিকেলের দিকে রোদ ডাইভিং পুলের মাথায়। সুধীর ভাবে—"শালা মকবুল, যাবার সময় বলে গেল একসাথে খাবো। বাঞ্চোৎ।"

হঠাৎ মনে হয় রোকেয়ার মৃত্যুতে সুধীরের কান্না পাচ্ছে না তো? তার বদলে বার বার ভেসে উঠছে মকবুলের মুখ। আর বার বারই সুধীর একটা করে কাঁচা খিস্তি দিচ্ছে। পাখির কথাগুলো মনে পড়ে "ওই বাচ্চার বাপ ছিলেন আপনি।" মকবুল হারিয়ে যায়। তার বদলে ভেসে ওঠে একটা বাচ্চার হাসিমুখ।

সন্ধ্যে উতরে রাত হয়ে গেছে খেয়াল করেনি সুধীর। দারুণ খিদে পেয়েছে। একটা হোটেলে এসে ঢোকে। অন্যমনস্কভাবে খাওয়া শেষ করে। ফিরে আসে কলুটোলার অন্ধকার ঘরে। জুতো ছেড়ে প্যাণ্ট পরেই শুয়ে পড়ে। এক অপ্রতিরোধ্য ক্লান্তি নেমে আসে সারা শরীরে। সুধীর ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে একটা বিরাট অন্ধকার গুহা হাঁ করে সুধীরকে তাড়া করছে। সুধীর ছুটছে প্রাণপণে। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকায়। না, চাপ চাপ অন্ধকার নিয়ে হাঁ করা বিরাট গুহাটা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। সুধীর হাঁপাচ্ছে। আর ছুটতে পারছে না। গুহাটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। ঠিক সেই সময় দ্যুম্ দ্যুম্ দরজা ধাক্কানোর শব্দে ঘুম ভেঙে যায় সুধীরের। ও হাঁপাচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যে ছুটেও মানুষ হাঁপায়। আবার দরজায় ধাক্কা। সেই সাথে জড়ানো কথা—সুধীর··· শ্লা···দরজা খোল! আমি···মক···বুল।

শালা আজ মাল টেনে এসেছে।

সুধীর গজগজ করতে করতে দরজা খুলে দেয়। হুড়মুড় করে ঘরে

ঢোকে মকবুল। জামা কাপড় জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। মুখে কপালে কালশিটে আর রক্তের দাগ। একটা চোখ ফুলে বন্ধ হয়ে গেছে। সারা মাথায় ধুলোবালি। ও ঘরে ঢুকেই বিছানার ওপর বসে পড়ে। মুখটা নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে।

—কি হয়েছে রে? সুধীরের প্রশ্নে মাথা তোলে মকবুল। দাঁত বার করে হাসে। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে রক্ত।

—শালা মাল ব্ল্যাক করতে গেলে মাঝে মাঝে এসব জোটে। ওরা প্রায় আট ন'জন মিলে আমাদের দুজনকে পিটিয়েছে। কিন্তু মাল ছাড়িনি। আজ শালা মরেই যেতাম, বুঝলি সুধীর। দুপুরে তোর সাথে খাবো কথা দিয়েছিলাম। রাখতে পারলাম না বলে তোর বেইমান দোস্তকে ক্ষমা করিস।

—মকবুল···

—একটু জল দে দোস্ত। সুধীর তাড়াতাড়ি জল গড়িয়ে দেয়। এতক্ষণে সুধীরের চোখে জল আসে। ন্যাকড়া ভিজিয়ে মকবুলের কালশিটে আর রক্তের ওপর চেপে ধরে।

—তুই শালা সুধীর আর জন্মে আমার বিবি ছিলি।

সুধীরের হাত থেকে ন্যাকড়াটা পড়ে যায়। তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে আবার চেপে ধরে। মকবুল টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে। মকবুলের মাথার নীচে সুধীরের বালিশ।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই সুধীর দেখে অঘোরে ঘুমুচ্ছে মকবুল। ডেকে তোলে ওকে। মকবুল এক চোখ মেলে চায়। অন্য চোখটা তখনও ফোলা এবং বন্ধ।

—হাতমুখ ধুয়ে নে মকবুল। আমি চা নিয়ে আসছি।

—তুই শালা আর জন্মে আমার ··

হনহন করে বেরিয়ে যায় সুধীর।

চা খেতে খেতে কোন ভূমিকা না করে সুধীর বলে—তোকে একবার হাসপাতালে যেতে হবে মকবুল।

—দূর শালা, চোরা মালের কারবারীদের এসবের জন্য হাসপাতালে যেতে হয় না। এমনিতেই সেরে যাবে।

—তার জন্য নয়। রোকেয়া কাল মারা গেছে। হাসপাতালের ঠাণ্ডা ঘরে লাশ রয়েছে। ওকে মাটি দিতে হবে তো?

মকবুল ফ্যাল ফ্যাল করে সুধীরের দিকে চেয়ে থাকে। যেমন অলৌকিক কোন রূপকথার গল্প শুনছে। কয়েকটা নিঃশব্দ মুহূর্ত। সুধীর ওকে হাত ধরে টেনে তোলে। পোশাক এগিয়ে দেয়। মকবুল স্বপ্নাবিষ্টের মতো সেগুলো পরে নেয়।

হাসপাতালের হিমঘর থেকে যখন রোকেয়ার লাশ বের করে আনা হল তখনও মকবুল নিশ্চুপ। নগ্ন রোকেয়ার মৃতদেহ পড়ে আছে সামনে। খানিকক্ষণ রোকেয়ার মৃত মুখের দিকে চেয়ে থেকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সুধীরের দিকে তাকায় মকবুল। এবার সুধীরের চোখের জল বাঁধ মানে না। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মকবুলকে আনুপূর্বিক সব খুলে বলে। স্থির দৃষ্টিটা রোকেয়ার মুখের ওপর রেখে মকবুল সব শোনে। কিন্তু একটাও কথা বলে না। ট্যাক্সি ডেকে লাশ তুলে শুধু বলে,—পার্ক সার্কাস গোরস্থান।

সাদা কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে মকবুলের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে রোকেয়া। মকবুল যেন পাথর হয়ে গেছে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে রোকেয়ার মুখের দিকে। ট্যাক্সি পার্ক সার্কাস গোরস্থানে পৌঁছে যায়। সুধীর লোকজন ডেকে কবর খোঁড়ার ব্যবস্থা করে। মকবুলের চোখে একফোঁটা জল নেই। রোকেয়ার কপালে, গালে, চোখে হাত বোলাতে থাকে।

—মকবুল এবার ওঠ! রোকেয়াকে মাটি দিতে হবে।

ঋজু শরীরে উঠে দাঁড়ায় মকবুল। ওর শরীরে যেন আর কোন ব্যথা নেই। রোকেয়াকে পাঁজাকোলে তুলে শুইয়ে দেয়। কবরে মাটি পড়তে থাকে। এক সময় রোকেয়া মাটির নীচে চলে যায়।

সুধীরের বুক ভেঙে কান্না আসে। ও চিৎকার করে ওঠে—মক-বু-উ-লল। একটু কাঁদ। একটু চোখের জল ফেল রোকেয়ার জন্য।

মকবুলের দু'চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। প্রচণ্ড আক্রোশে সুধীরের দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকায় আর বলে—বেইমান·বেইমান··· বেইমান···

ছুঁড়ে দেয় সুধীরকে রোকেয়ার কবরের ওপর। ক্ষীণ একটা রেখা ফুটে ওঠে ওর দুই ঠোঁটের ফাঁকে। সুধীর বোঝে না ওর হাসিটা রাগের না দুঃখের।

—আমি আর ফিরবো না…এবার থেকে ওই ঘরে তুই একাই থাকিস বেইমান…

মকবুল হনহন করে হেঁটে বেরিয়ে যায় গোরস্থান থেকে। নিঃশব্দ নির্জন গোরস্থানে সুধীর একা। শেষবারের মতো আছড়ে পড়ে রোকেয়ার কবরের ওপর। চিৎকার করে বলে—দেখো রোকেয়া, মকবুল আমাকে ভুল বুঝলো। তোমার কথা রাখতে গিয়ে আমি বেইমান হয়ে গেলাম। কান্নায় ভেঙে পড়ে সুধীর হালদার। পর চারপাশ থেকে কারা যেন বলতে থাকে "ওই বাচ্চার বাপ ছিলেন আপনি।"

॥ আঠার ॥

কিটব্যাগ কাঁধে তপন এসে দাঁড়ায় ওদের বাড়ির সামনে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে বাড়িটার দিকে। সব তেমনি আছে। শুধু বারো বছর বয়সের ছাপ বাড়িটার সারা গায়ে। দেওয়াল-গুলো শ্যাওলা ধরেছে। কাঠের গেটটা নড়বড়ে। তপন বারান্দায় এসে উঠতেই বেরিয়ে আসেন শশাঙ্ক দাশগুপ্ত। তপনের মনে হয় এই ক' বছরে বাবাও যেন অনেক বুড়ো হয়ে গেছে। তপনকে সামনে দেখে উনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। হাতে বাজারের থলে। তপন এগিয়ে এসে প্রণাম করে।—কেমন আছ বাবা ?

বৃদ্ধ শশাঙ্কবাবু যেন অনেক দিনের চাপা অভিমানে কথা বলতে পারেন না। শুধু পালটা প্রশ্ন করেন—তুই কি কিছুদিন থাকবি না চলে যাবি ?

—দিন দশেক আছি। মিলন কোথায়, তুমি বাজারে যাচ্ছ ?

—মিলুর আজ কুড়িদিন ধরে জ্বর। ছাড়তে চাইছে না। বোধহয় প্যারা টাইফয়েড। তুই বোস বিশ্রাম কর। আমি ফিরে এসে তোর সাথে কথা বলছি।

তপন ভেতরে ঢুকে কিটব্যাগটা রাখে। পাশের ঘরে যায়। মিলন শুয়ে আছে বিছানায়। রুগ্ন চোখের দৃষ্টিটা যেন অনেক নিষ্প্রভ। মিলন

চেয়ে থাকে তপনের দিকে। তপন ওর কপালে একটা হাত রেখে জিজ্ঞাসা করে—কেমন আছিস ?

—ভালো। তুমি কেমন আছ দাদা ?

—আমি ভালোই আছি। কিন্তু তুই অসুখ করে বিছানায় শুয়ে আছিস আর বলছিস ভালো ?

—আগের চেয়ে ভালো। তবে দুর্বলতা এখনও কাটেনি। আর শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে না। আমি তো ভেবেছিলাম তোমাকে আর কোনদিন দেখতেই পাব না। আজ কয়েক বছর ধরে তোমার মনিঅর্ডার আসছে। কিন্তু তোমার কোন ঠিকানা নেই। কোন চিঠিও তুমি লেখ না।

তপন একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়েছিল। ও ভাবছিল অন্য কথা। শেলী ট্যাণ্ডনকে এড়াবার জন্যই বলেছিল ছোট ভাইয়ের অসুখ। অথচ সত্যিই মিলনকে অসুস্থ দেখবে ভাবতেও পারেনি।

—দাদা, কথা বলছো না কেন ?

সংবিৎ ফিরে পায় তপন। মিলনের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে—হ্যাঁ, কি বলছিলি বল ?

—বলছিলাম তুমি কেন চলে গিয়েছিলে ? বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাবার সাথে তো তোমার কোন ঝগড়া বিবাদ হয়নি ?

—না কোন ঝগড়া হয়নি। একলা বাঁচবো বলেও নয়। পৃথিবীটা চিনতে বেরিয়েছিলাম। সেই সাথে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। যোগ্যতা যাচাই করাও আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল। যাবার আগে বাবাকে একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলাম। বাবা যেন থানা পুলিস না করে। তোর কথা, বাবার কথা প্রায়ই মনে হত। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মানুষ না হতে পারলে বারুইপুরে ফিরবো না। অবশ্য এখনও সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হতে পারিনি।

—তাহলেও তুমি নিশ্চয়ই ভালো রোজগার করো। তোমার পাঠানো টাকার অঙ্ক দেখলেই বোঝা যায়। আচ্ছা দাদা, তুমি এখনও কোন ঠিকানা দাও না কেন ?

—আমার থাকার কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই বলে। আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরতে হয়। যাকগে, তোদের রান্না-বান্না কে করে ?

—একটি মেয়ে আছে। খুব দুঃস্থ। আমাদের রান্না-বান্না করে দিয়ে বাড়ি চলে যায়। আবার সন্ধ্যের সময় আসে রান্না করে খেয়ে চলে যায়। বাসন মাজার জন্য একজন ঠিকে ঝি আছে।

—তুই এখন কি করছিস বল তো? তপন প্রশ্ন করে।

—কি আর করবো। বি. এ. পাস করে বেকার বসে আছি। তোমার পয়সায় খাচ্ছি আর টিউশানির পয়সায় দরখাস্ত ছাড়ছি। ইতিমধ্যে দরজার সামনে একটি মেয়েকে দেখা যায়, মিলন বলে ওঠে —লতা এসো, দাদার সাথে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে লতা ভেতরে ঢোকে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে তপন তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নেয় এবং হাত দুটো চেপে ধরে!

—পায়ে হাত দিয়ে প্রণামের নিয়ম উঠে গেছে। হাতজোড় করে নমস্কার জানাতে হয়।

—আপনি চা খাবেন তো? স্মিত হেসে প্রশ্ন করে লতা।

—হ্যাঁ। তা একটু খাবো।

লতা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মিলন জিজ্ঞাসা করে—তুমি কতদিন থাকবে দাদা?

—দিন দশেক আছি।

—এখানেই থাক না। কত লোক তো বারুইপুর থেকে ডেইলী প্যাসেঞ্জারী করে।

—বললাম যে, আমার কাজের জায়গার কোন ঠিক নেই।

ইতিমধ্যে লতা চা নিয়ে ঢোকে। লতার সরল নিষ্পাপ মুখের দিকে চেয়ে তপনের হঠাৎ মিঃ বোহরার মুখখানা ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে যায়।

দুপুরে খেয়েদেয়ে একটা টানা ঘুম দিয়ে তপন তৈরি হতে থাকে অলকের বাড়ির উদ্দেশে। কোন তাড়া নেই, কোন কাজ নেই। এক নিস্তরঙ্গ নিরুদ্বিগ্ন জীবন। বেরোবার মুখে লতা জিজ্ঞাসা করে—কখন ফিরবেন দাদা?

চমকে ওঠে তপন। কোন মেয়ের মুখ থেকে দাদা সম্বোধন সে শোনেনি। ফিরে তাকায় লতার দিকে। ওর চোখে কোন লোভ নেই। নেই কোন অভিপ্সা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে তপন জবাব দেয়

—ঠিক বলতে পারছি না। তুমি আমার খাবারটা ঢাকা দিয়ে রেখে চলে যেও।

—শুধু শুধু ঠাণ্ডা খাবার খাবেন কেন। আটটার মধ্যে ফিরবেন আমি থাকবো। দেরি করবেন না।

—আচ্ছা। নিজের অজান্তেই বেরিয়ে আসে তপনের মুখ দিয়ে।

অনেক উন্নতি হয়েছে বারুইপুরের। চারিদিকে বিজলিবাতির ছড়-ছড়ি। অনেক অলিগলিতেও আজ আলো। অলকের নির্দেশ মত চলছে তপন। ঐ তো সেই মন্দির। ওর পাশ দিয়ে গলিটায় ঢুকে বাঁদিকে তিনখানা বাড়ির পর অলকের বাড়ি। নির্দেশিত বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকতেই বেরিয়ে আসে অলক।

—আয় তপু, আমি তোর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

তপন ভেতরে ঢোকে। সদ্য চুনকাম করা ঝকঝকে ঘর। এক-পাশে একটা ছোট টেবিলের ওপর একটা রেডিও। তার পাশে সস্ত্রীক অলকের স্ট্যাণ্ড ফটোগ্রাফ। অলকের বৌএর মুখখানা বেশ মিষ্টি। তপনকে বসতে বলে অলক ভেতরে যায়। তপন আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। সারা ঘরে যেন বেশ সুখী সুখী ভাব। অল্প জিনিসেও সাজানো ঘরখানায় যেন দরদী হাতের ছোঁওয়া। পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

—বল তোর কি খবর? অলক ভেতর থেকে ঘরে ঢোকে।

—খবর বলতে চাকরি করি। এমন বিদকুটে চাকরি যে কখন কোথায় থাকতে হবে নিজেও জানি না। থাক্‌গে তোর খবর বল। বিয়ে তো করেছিস। এবার গোছানো ঘর অগোছালো করার জন্য একজন নতুন অতিথিকে আন।

তপনের কথা শেষ হতেই ঘরে ঢোকে পূরবী। অলকের স্ত্রী। অলক ওদের পরিচয় করিয়ে দেয়। হাতে ধরে রাখা চা আর ডিমের ওমলেট টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখে পূরবী।

হাসি গল্পে সময় গড়িয়ে চলে। এক সময় পূরবী বলে—এবার আপনি একটা বিয়ে করুন তপনবাবু।

—নাঃ। ওই ইচ্ছেটা মোটেই নেই। মানে ব্যর্থ প্রেমের ব্যাপার

ব্যাপার নয়। একটা বিদকুটে চাকরি আমার। বিয়ে করে স্ত্রীকে সঙ্গ দিতে না পারলে সে বিয়ের কোন মানে হয় না।

—আহা প্রবাসী চাকুরেরা বুঝি বিয়ে করে না?

—করে। তবে আমার জীবনদর্শন আলাদা। সারা বছর তাকিয়ে থাকতে হবে তিনটে মাসের ছুটির জন্য। কোন মানে হয়?

—এটা কিন্তু তপন ঠিক বলেছে। বলে ওঠে অলক। তুমি বাপের বাড়িতে দুদিনের বেশী তিন দিন থাকলে আমার খারাপ লাগে। সুতরাং সেদিক থেকে বিচার করলে তপনের কথা একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। যাকগে ওসব কথা। তপনকে দুখানা গান শুনিয়ে দাও না। জানিস তপন, পূরবী খুব ভাল রবীন্দ্র সংগীত গাইতে পারে।

—গান না। কত দিন সামনাসামনি কারও গান শুনিনি।

পূরবী গান গায়। তবলা বাজায় অলক। বেশ কিছু গান শুনে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসে তপন। দুটো নিষ্কলুষ চোখের চাহনি ওকে মনে করিয়ে দেয় আটটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। সশ্রদ্ধ ও শাসনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আন্তরিকতাকে অস্বীকার করতে পারে না তপন।

মন্দিরে তখন আরতির ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং ঢং। তপন দাঁড়িয়ে পড়ে। কি এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে বুকের মধ্যেও বাজতে থাকে ঢং ঢং ঢং ঢং। মন্দিরের কোন দেব-দেবীর মূর্তি চোখে পড়ে না। তবু তপনের হাত দুটো নিজের অজান্তেই বুকের কাছে উঠে আসে। গরম হাওয়ার খানিকটা বেরিয়ে আসে বুক খালি করে। তপন আবার বাড়ির দিকে এগোতে থাকে। ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে চাপ দাড়িওলা একখানা মুখ। হাতে অনেকগুলো বিশ্ব সাহিত্যের বই। মূর্তিটি বসে আছে গঙ্গার পারে। ওর উদাস দৃষ্টির সামনে নদীতে জোয়ার ভাঁটা খেলে।

দেখতে দেখতে দশটা দিন কেটে যায়। নিশ্চিন্ত দশটা দিন। স্বাভাবিক সুন্দর জীবন। আবার তাকে মুখোশ পরতে হবে। সাজ বদল করে আবার তাকে নামতে হবে এক নতুন রঙ্গমঞ্চে। এবার তার ভূমিকা এক আত্মভোলা অধ্যাপকের। বই ছাড়া যে জীবনে আর কিছু জানে না।

বারুইপুর স্টেশন। কিছুক্ষণ পরেই সে পৌঁছুবে কলকাতায়। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় মানুদার চায়ের দোকানের দিকে। হাতে এখনও বেশ খানিকটা সময়। বিষন্নতার প্রতিমূর্তি মানুদা আপন মনে চা করছে। ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে কয়েকজন খদ্দের। তপন একপাশে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায়।

—কেমন আছো মানুদা?

—ভাল আছি ভাই। তপন তো? তোমার কথা প্রায়ই ভাবতাম। কত দিন আছো?

—আজই ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়। তোমাকে দেখলে তোমার সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে, বুঝলে মানুদা?

হঠাৎ কিসের ধাক্কায় মানুদা যেন একটু থমকে যায়। একবার তপনের মুখের দিকে তাকায় আবার চায়ের কাপে চিনি গুলতে থাকে।

—কি নাম যেন? তপন জিজ্ঞাসা করে।

—কেকা। মা মরা মেয়ে। তিন বছর থেকে বুকে করে মানুষ করলাম। বাপের গলা জড়িয়ে না ধরে ঘুমোতে পারতো না। আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠলো। লেখাপড়াও শিখলো একটু। ভাবলাম এবার ওর বিয়ে দেবো। তা পছন্দ হলো না। বললো—আমি চলে গেলে তোমার কষ্ট হবে। তাই বলে কি মেয়ে বড় হলে বিয়ে দিতে হবে না? ভাবনা চিন্তায় দিনগুলো কাটছিল। এর মধ্যে লক্ষ্য করলাম মেয়ে যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। প্রায়ই দেখতাম দাওয়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো। কানাঘুষো শুনলাম বাড়িতে নাকি একটি ছেলে যাতায়াত করে। তারপর একদিন কানু ঘোষের বউ দরজার আড়াল থেকে জানালো কেকা নাকি পোয়াতি। আমি সহ্য করতে পারলাম না। রাগের মাথায় ওকে মারধোর করলাম। পরের দিন দোকানে আসার সময় বলে এলাম—ফিরে এসে যেন তোর মড়া মুখ দেখি।

ডুকরে কেঁদে ওঠে মানুদা। অনেক কষ্টে ঢোক গিলে বলে—রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখি কেকা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। তুমি বলো তো তপন ভাই ও চলে যাওয়ায় এখন আমার কষ্ট হচ্ছে না? গেলিই যদি ওইভাবে গেলি কেন? আমি তোকে শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে গলায় মালা পরিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতাম! কাপড়ের খুঁটে চোখ মোছে

মান্নুদা। আত্মস্থ হবার চেষ্টা করে বলে,—সব শত্রু। ওর মা-ও আমার সাথে শত্রুতা করে গেল, কেকাও তাই। জানো তপন ভাই, তার পরেও আমি বেঁচে আছি। দেখি আরও কত দুঃখ আছে আমার কপালে। গাড়ি আসার সিগন্যাল দেয়। তপন ওর রুমালটা একবার চোখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে বলে—চলি, মান্নুদা আমার গাড়ি এসে গেছে।

—হ্যাঁ ভাই এসো। যার যখন গাড়ি আসবে তাকে তো যেতেই হবে।

॥ উনিশ ॥

সুধীর হালদারের স্টাডি নিখুঁত। শান্ত হাজির হয় ডাঃ সান্যালের বাড়িতে। ডাঃ সান্যাল তখন বাড়িতে নেই। দরজা খুলে দেয় বেলা। সৌজন্যের খাতিরে হাত জোড় করে নমস্কার করে শান্ত।

বেলাও প্রত্যুত্তর দেয়। বেলার চোখে এক সবহারানো বিষণ্ণতার ছায়া। ওই বিষণ্ণতার সুযোগটুকুই নিতে হবে।

—আমি স্মিথ ফার্মাসিউটিক্যালস থেকে আসছি। ডাঃ সান্যালের সাথে একটু দেখা করতে চাই।

—উনি এ সময় বাড়ি থাকেন না। বাজারের কাছে ডিসপেন্সারী। ওখানে গেলেই দেখা পাবেন।

—অনেক ধন্যবাদ। শান্ত আর দাঁড়ায় না। বারান্দা থেকে নেমে একবার হাসিমুখে পেছনে তাকায়। আধখোলা দরজা ধরে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে বেলা।

বাজারের কাছে একটা চায়ের দোকানে বসে চা খায় শান্ত। নতুন ওষুধগুলোর নাম আরও একবার ঝালিয়ে নেয় মনে মনে। সত্যাশ্রিত মিথ্যা। ওষুধগুলো নতুন। ওগুলো বাজারে চালানোর জন্য দরবার করাও মিথ্যে নয়; কিন্তু আসল উদ্দেশ্যর কাছে এরা সব মিথ্যে। সাজানো প্রহসন।

ডাঃ সান্যালের ডিসপেন্সারীতে পৌঁছে দেখে উনি কলে বেরিয়ে গেছেন। কম্পাউণ্ডারের কথায় শান্ত জানতে পারে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে উনি ফিরবেন না। শান্ত এটাই চাইছিল। তবু ডাঃ সান্যালকে একবার চোখের দেখা দেখতে পারলে হতো।

আবার ডাঃ সান্যালের বাড়ি। যথারীতি দরজা খুলে দাঁড়ায় বেলা। শান্ত হাসে।

—আপনাকে বার বার বিরক্ত করছি।

—ডাক্তারের মেয়ে হলে ওটুকু সহ্য করতে হয়।

শান্ত হাসে। সেই শিশুর মতো সরল হাসি। যে হাসির কথা বীথি প্রায়ই বলতো।

—ডিসপেন্সারীতে ওঁকে পেলাম না। অথচ আমার হাতে সময়ও নেই। মিস সান্যাল, আপনি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন?

বেলা হাসে। পল্লবিত কালো চোখ অভিব্যক্তিহীন।

—ভেতরে আসুন।

সুধীর হালদারের বিবরণ ঠিকই। শান্ত একে একে ওষুধগুলো বার করে। স্মিথ ফার্মাসিউটিক্যালসের অভিজ্ঞ সেলসম্যানের মতো ওষুধের সাথে লিটারেচারগুলো সাজিয়ে রাখতে থাকে। বেলার দিকে একবারও তাকায় না। তাকালে দেখতো বেলা মোটেই ওষুধ দেখছে না। দেখছে শান্তকে।

—আপনি চা খাবেন?

বেলার প্রশ্নে শান্ত মুখ তুলে তাকায়। —থাক না আপনার অসুবিধা হবে।

—কোন অসুবিধা হবে না। পাঁচ মিনিট।

বেলা ভেতরে চলে যায়। শান্ত ওষুধ সাজাতে থাকে। এটাই নিয়ম। শান্ত আরও মনোযোগী হবার চেষ্টা করে। পাঁচ মিনিট অনেকটা সময়। ব্যাগের ভেতরে অকারণে কি যেন খোঁজে। এ খেলাতে শান্তকে জিততেই হবে। ভেতরে চায়ের কাপ ডিসের টুংটাং আওয়াজ শোনা যায়।

—আমার দেরি হলো কি? চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বেলা প্রশ্ন করে।

—দেরি মানে? আমার তো মনে হলো চা তৈরীই ছিল, আপনি শুধু এনে দিলেন। বসুন না!

বেলা ডাক্তার সান্যালের চেয়ারটায় বসে। শান্ত সহজভাবে বলে—আপনাকে কিন্তু সত্যিই ডাক্তার মনে হচ্ছে।

—আমি জীবনেও ডাক্তারী পড়িনি।

—বিভিন্ন হাসপাতালে যে সব মেডিকেল স্টুডেণ্ট দেখি তারা তো আপনার মতোই…

—আমার মতো কি?

—কিছু না। শান্ত ওষুধগুলোর গুণাগুণ বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বেলা সব শোনে। মৃদু হেসে বলে—আপনি কিন্তু আমাকে সত্যিই ডাক্তার মনে করছেন। আপনার সব কথা বাবা ছাড়া আমার পক্ষে বোঝা মুশকিল।

—ঠিক আছে, আজ তাহলে উঠি। কখন এলে ওঁকে ফ্রি পাবো বলুন তো?

—বিকেলের দিকে।

—ঠিক আছে, দিন তিনেক পরে আমি আবার আসবো। আপনি দয়া করে এগুলো ডাঃ সান্যালকে দিয়ে দেবেন।

শান্ত ওঠে। ব্যাগটা হাতে নিয়ে রাস্তায় নামে। নিজের মনেই বলে, সাবাস শান্ত চালিয়ে যাও।

—কি এত ভাবছো গো? কুহেলি শান্তর চুলগুলো নেড়ে দিয়ে প্রশ্ন করে। —তোমার নতুন অভিযান সাকসেসফুল?

শান্ত তাকায় কুহেলির দিকে। ও জানে শান্ত আরও একটি মেয়ের সর্বনাশের খেলায় নেমেছে। অথচ কুহেলির মনে তার জন্য কোনও ভাবান্তর নেই। ও কি নিজের মনটাকে পাথর করে ফেলেছে?

—এবারকার মেয়েটির নাম কি গো?

—অফিসিয়ালি আমি এখনও তার নাম জানি না। শুনেছি বেলা সান্যাল।

—প্রথম দিনেই এর চেয়ে বেশী আর কি করে হবে। তবে তুমি পারবে।

—কি করে বলছো ?

কুহেলি চুপ করে যায়। জবাব না দিয়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে থাকে।

—কি হলো বললে না ?

—অ্যাঁ…ইয়ে…মানে পারতে তোমাকে হবেই। না হলে তোমার চাকরি থাকবে না।

—ভারী শক্ত আর আত্মবিশ্বাসী মেয়ে। চোখে মুখে বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে।

—প্রথম প্রথম মেয়েরা একটু শক্ত থাকে। তারপর মাখনের চেয়েও নরম হয়ে যায়। মেয়ে-মানুষরাও তো মানুষ! কতক্ষণ আর নিজেকে আড়াল করে রাখবে ?

—মাখনের মতো নরম মেয়েরাও কিন্তু পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়।

—তাই বুঝি ? কুহেলির চোখে এক অবিশ্লেষণীয় হাসি।

—তোমাকে একটা অনুরোধ করবো ? শান্ত আবেগভরা গলায় বলে।

—একটা কেন, যত খুশী করতে পারো। শুধু চাকরির বিরুদ্ধাচরণ করতে বলো না।

—আমার জন্য না হয় একটু করলে।

—শান্ত, আমি তোমার বেলা সান্যাল নই। মিঃ বোহরার আণ্ডারে চাকরি করা একটা মেয়ে। দেহ দিয়ে, হাসি দিয়ে তোমাকে আনন্দ দেওয়া আমার কর্তব্য। আমি করবো। কিন্তু শান্ত, মনটা এখনও আমার নিজের।

—তাহলে তুমি আমার সাথে যা করো সবটাই অভিনয় ?

—অফ কোর্স্। তুমি কি এর মধ্যে সত্যতা খোঁজবার চেষ্টা করো নাকি ?

—তোমার বেলায় করতাম।

হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ে কুহেলি। হাসতে হাসতে বলে—তুমি ভালো অভিনেতা স্বীকার করছি।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আবার বলতে থাকে—আমিও তো ঠকে যাওয়া একটা মেয়ে। দুজনার পরিচয় যখন দুজনেই জানি, তখন কেন আর ওসব আজেবাজে কথার আশ্রয় নিচ্ছ ? নিজেকে সংযত করার চেষ্টা

করে কুহেলি। আবার বলতে থাকে—এক প্রবঞ্চক একটি প্রবঞ্চিতাকে ভালবাসার কথা শোনাচ্ছে। কি হাস্যকর তাই না শান্ত? তপন আমাকে এনেছে, তুমি বীথিকে। তপনের এখানে আসার কোন অনুমতি নেই। যেমন তোমার নেই বীথির কাছে যাবার। হয়ত এইভাবে তপনও বীথিকে ভালবাসার কথা শোনাচ্ছে। ভালো কথা, তোমাকে একটা কথা মনে করিয়ে দেবার ছিল। পিয়ালী নামে মেয়েটিকে সম্পর্ক-চ্ছেদের ব্যাপারে তোমার কি একটা চিঠি লেখার আছে, লিখে মিঃ বোহরাকে দিয়ে দিও।

হঠাৎ পিউর নামটা কানে আসতেই চুপসে যায় শান্ত। এক অসহ্য যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে ওঠে শান্তর বুকে। কানে বাজতে থাকে—আমি এক সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে শান্ত। অর্থের জোর নেই স্বীকার করছি। কিন্তু মনের জোর পরীক্ষা করলে ইতিহাসের সেলিম-আনার, রোমিও-জুলিয়েটরাও লজ্জা পেয়ে যাবে। ওইটুকু সম্বল করেই তো বেঁচে আছি।

—এই নাও। কুহেলি কাগজ কলম এনে সামনে রাখে।

শান্তর চোয়ালদুটো শক্ত হয়ে ওঠে। মনে মনে বলে—তোমাকে বাঁচতে দেবো না পিউ। শান্ত চিঠি লিখতে থাকে। কুহেলি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। চিঠি লেখা শেষ হয়। কুহেলি এক কাপ চা নিয়ে ফিরে আসে। শান্তকে দারুণ ক্লান্ত মনে হয়। শান্ত চিঠিখানা এগিয়ে দেয় কুহেলির দিকে।

—ও চিঠি পড়ার কোন অনুমতি নেই শান্ত। ওটা তুমি মিঃ বোহরার কাছেই দিয়ে দিও।

—এর সাথে আমাদের চাকরির কোন সম্পর্ক নেই। প্রবঞ্চক-প্রবঞ্চিতার প্রশ্নও এখানে নিরর্থক। হয়ত এটাই আমার জীবনের শেষ চিঠি। অন্ততঃ তুমি এর সাক্ষী থাকো। পড়ো। প্লিজ কুহেলি পড়ো। মুখ নীচু করে শান্ত।

কুহেলি চিঠিখানা টেনে নেয়। শান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায় শান্ত। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে ঝুঁকছে দিন। বারান্দার কার্নিশে দুটো চড়ুই পাখি একে অন্যকে কি যেন বলছে। পুরুষ পাখিটি যেন কোন অভাবনীয় ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে। শান্ত নিশ্চল হয়ে ওদের দেখে। এক সময় পাখি দুটো উড়ে যায়।

শান্ত সামনের ছোট উঠোনটায় নেমে আসে। ওর সামনে সেই অন্ধকার গলিপথ। পেছনে একবার ফিরে তাকায়। তারপর আস্তে আস্তে গলিপথে ঢুকে পড়ে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। শান্ত পাশের দেওয়ালে কান পাতে। আজ আর কোন কান্নার আওয়াজ নেই। নীরব নিস্পন্দ। শান্তর চিৎকার করে বলে উঠতে ইচ্ছে করে—কে কাঁদছিলে কাঁদো, আমি তোমার কান্না শুনতে চাই। কিন্তু কোন আওয়াজ বেরোয় না শান্তর গলা দিয়ে। দেওয়ালে কান পেতে যেন নিজের কান্নাই শুনতে পায়। হঠাৎ পেছনে কার হাতের স্পর্শে চমকে পেছনে তাকায়। অন্ধকারে মুখ দেখতে পাচ্ছে না। তারপরেই শুনতে পায়—ভেতরে চলো শান্ত। আমার চিঠি পড়া হয়ে গেছে।

সম্মোহিতের মত শান্ত কুহেলির পেছন পেছন আসে। ঘরে ঢোকার সাথে সাথে কুহেলি মুখোমুখি দাঁড়ায়। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করে—দেওয়ালে কান পেতে কি শোনবার চেষ্টা করছিলে ?

শান্ত নির্বাক্ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কোন জবাব দেয় না। কুহেলির চোখে জ্বলন্ত চাহনি।

—জবাব দিচ্ছ না কেন ? হুঁঃ দেওয়ালে কান পেতে কান্না শুনছো। নিজের বুকে কান পাতো, অনেক কান্না শুনতে পাবে। বীথির কান্না শোনার কোন প্রয়োজন নেই। শেষের কথাগুলো এত বেশী বিদ্রূপ আর শ্লেষ মেশানো যে শান্তও উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

—আমার কাজের কৈফিয়ৎ কি তোমার কাছে দিতে হবে ? শান্ত একটু উষ্মার সাথে বলে।

—আইনগতভাবে সে ক্ষমতা হয়ত আমার নেই। তোমাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেবার পরেও তোমার ওপর লক্ষ্য রাখাও আমার একটা কাজ। তোমার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখলে আমি মিঃ বোহরাকে রিপোর্ট করতে পারি। সুতরাং বেশী চেঁচিয়ে কথা বল না। তোমার কাজই তো হলো অসহায় মেয়েদের কাঁদানো। তারপর সেই কান্না শোনবার চেষ্টা করা মানে হয় প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা নয় অত্যন্ত বোকামী। শান্ত, তোমার মত ছেলেদের তো বিবেক থাকা উচিত নয় ?

—আমি যে বীথির কান্না শুনি তুমি জানলে কি করে ?

—আপাততঃ বীথি ছাড়া এখানে কেউ কাঁদে না। অবশ্য এ বাড়িটার

দেওয়ালে কান পাতলে অনেক মেয়ের কান্না শোনা যাবে। এ বাড়িটা'র জমাট অন্ধকারে শুধু কান্নার ইতিহাস। তবে বীথির সাথে তোমার কোনোদিন দেখা হবে না।

—কেন? অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করে শান্ত। এক দুর্বোধ্য হাসি ফুটে ওঠে কুহেলির মুখে। সে হাসির কোন মানে খুঁজে পায় না শান্ত।

—এটাই এখানকার নিয়ম। যে যাকে আনবে তাদের দুজনের আর কোনোদিন দেখা হবে না। তাই বীথির কান্না শোনার অধিকার নেই তোমার।

শান্তর মুখখানা মলিন কারুণ্যে ছেয়ে যায়। জলভরা দুই চোখে তাকায় কুহেলির দিকে। হঠাৎ কুহেলির দুখানা হাত ধরে বলে—তুমি আমাকে একবার বীথিকে দেখবার সুযোগ করে দেবে কুহেলি? আর কোনোদিন কোনো অনুরোধ করবো না। প্লিজ কুহেলি, মাত্র একবার।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয় কুহেলি। দু'চোখে আগুন ছড়িয়ে বলে—মিথ্যেবাদী, কাপুরুষ, নীচ, এতই যদি দুর্বলতা তবে এ কাজে নেমেছিলে কেন? লজ্জা করছে না তোমার? এটা আমার নিজের বাড়ি হলে আমি থুথু ছিটিয়ে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে তোমাকে বাড়ির বার করে দিতাম। এই তুমিই না কিছুদিন পরে বেলা সান্যালকে আনবে? এই তুমিই না কিছুক্ষণ আগে পিউর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে চিঠি দিয়েছো? একনাগাড়ে কথাগুলো বলে উত্তেজনায় কুহেলি হাঁপাতে থাকে।

—তুমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গেছ কুহেলি। একটু বিশ্রাম করো। আমি মিঃ বোহরার কাছ থেকে একটু ঘুরে আসছি। শান্ত টেবিলের ওপর থেকে পিউকে লেখা চিঠিখানা নিয়ে হনহন করে বেরিয়ে যায়।

গুপ্তঘরে ঢুকে টিউবের বোতাম টিপতেই ওপাশ থেকে মিঃ বোহরা'র গলা শোনা যায়:

—আমি শান্ত বলছি স্যার। পিয়ালীকে লেখা চিঠিখানা আপনা'র কাছে পৌঁছে দিতে চাই।

—আমি একটু ব্যস্ত আছি শান্ত। চিঠিখানা তুমি কুহেলির কাছে রেখে দাও। আমি পরে নিয়ে নেবো। আজ রাতটাও তুমি গেস্ট হাউসে থাকবে। কাল মাঝদিয়া ঘুরে এসে আমার কাছে রিপোর্ট করবে।

শান্ত ফিরে এসে দেখে কুহেলি পাথরের মূর্তির মত বসে আছে। স্থির দৃষ্টি দেখলে মনে হয় ও যেন অনেক দূরে কোথাও হারিয়ে গেছে। শান্ত ওর ওই সমাহিত ভাবটা কাটাতে চায় না। খানিকক্ষণ ওর দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে থেকে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ বাড়িটার ভেতরে এক নির্জন বারান্দায় দাঁড়িয়ে শান্তর মাথার ভেতরে এক বিশাল জনতার কোলাহল। অনেক কণ্ঠস্বরের মধ্যে শান্ত যেন একটা বিশেষ কণ্ঠস্বর শোনবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। সমুদ্রপারে দাঁড়িয়ে কথা বলার মত। প্রাণপণে চেঁচিয়েও যেখানে কণ্ঠস্বর ক্ষীণ শোনায়।

টুক করে বারান্দার আলোটা জ্বলে ওঠে। দেওয়ালের সুইচে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুহেলি। ধীর পায়ে এগিয়ে আসে শান্তর দিকে। শান্তর হাত দুটো বুকের কাছে তুলে নির্বাক্ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শান্তর দিকে। শান্তর মুখেও কোন কথা নেই। কুহেলির চোখে এক অব্যক্ত বেদনার ছায়া। এক সময় শান্তর বুকে মাথা রাখে কুহেলি। শান্তর হাত দুখানাও বেষ্টন করে ধরে ওকে।

—বীথির সাথে দেখা করতে চাও? ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে কুহেলি।

—যদি তোমার কোন অসুবিধা না হয়, তবে অন্ততঃ একবার···

—কথা বলতে পারবে না। শুধু দূর থেকে একবার দেখবে।

চকচক করে ওঠে শান্তর চোখ দুটো।—তোমাকে অনেক ধন্যবাদ কুহেলি। দূর থেকে চোখের দেখাই একবার দেখবো।

॥ কুড়ি ॥

মিঃ ট্যাণ্ডন আর শেলী ঢুকতেই মিঃ বোহরা ওদের অভ্যর্থনা করে। আসন্ন নাটক সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলার পর শেলী জিজ্ঞাসা করে—আন্টি কি ভেতরে আছেন আঙ্কল ?

—হ্যাঁ, তুমি ভেতরে যাও। মিঃ বোহরা হাসিমুখে জবাব দেয়।

শেলী ভেতরে ঢোকে। সীমা ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে শেষবারের মতো পাউডারের পাফটা মুখে বুলিয়ে নিচ্ছিল। শেলীকে ঢুকতে দেখে বলে—এসো শেলী। কি খবর ?

-তুমি কোথাও বেরুচ্ছো আন্টি ?

—হ্যাঁ। একটু মার্কেটিং আছে। আজ তোমাদের তো আবার রিহার্সাল আছে, তাই না ?

—হ্যাঁ আছে।

শেলীর চোখদুটো চঞ্চল হয়ে এদিক ওদিক ঘুরছে। সীমা লক্ষ্য করে বলে—কাকে খুঁজছো শেলী ?

আচমকা কথাটা শেলীকে যেন একটু ধাক্কা দেয়। আমতা আমতা করে বলে—ইয়ে মানে···

—তপন একটু পরেই আসবে। তবে কালকেই বোধহয় ওকে বাইরে বেরিয়ে যেতে হবে।

—আন্টি! শেলীর চোখে এক অদ্ভুত তৃপ্তির চাহনি। আমি আর তপনবাবুও তোমার সাথে যাবো? আজ রিহার্সাল করতে ইচ্ছে করছে না। তুমি মার্কেটিং করবে আমরা পেছনে কথা বলতে বলতে যাবো।

সীমা তাকায় শেলীর দিকে। সীমার কাঁধে চিবুকের ভর রেখে শেলী বলে—আন্টি প্লিজ···

শেলীর মুখখানা দু'হাতের মধ্যে রেখে সীমা বলে—খুব ভাল লেগেছে তপনকে না ?

শেলী কোন উত্তর না দিয়ে সীমার বুকে মুখ লুকোয়। সীমা হাসতে হাসতে বলে—ঠিক আছে, তোমরাও চলো।

শেলী ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ওদিকে মিঃ বোহরা আর মিঃ ট্যাণ্ডন গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। আসন্ন নাটকের প্রস্তুতি থেকে সে

আলোচনা তখন ব্যবসা-বাণিজ্যে ঘুরে গেছে। দুজনের হাতেই দুটো চুরুট। এমন সময় ঘরে ঢোকে তপন।

—হ্যালো তপন, গুড ইভনিং।

তপন মিঃ বোহরা এবং মিঃ ট্যাণ্ডন দুজনকেই শুভ সন্ধ্যা জানায়। শেলীর দিকে তাকিয়ে তপন শুধু হাসে। শেলী ঘাড় কাত করে।

—তোমাকে দেখে আমার খুব লোভ হয় তপন। তোমার মতো একজন ব্রাইট ইয়ং ম্যান আমার বিজনেসে পেলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। কিন্তু আমি জানি মিঃ বোহরা তোমাকে ছাড়বেন না।

মিঃ ট্যাণ্ডনের রসিকতায় ওরা তিনজনেই হেসে ওঠে। ইতিমধ্যে শেলী বলে—ড্যাডি, আমি আন্টির সাথে একটু বেরোচ্ছি। মিঃ দাশগুপ্ত, আপনাকে আন্টি একটু ডাকছেন।

—যাও তপন, ভেতরে যাও। তোমার বৌদিকে দু' কাপ কফি পাঠিয়ে দিতে বলো তো? তপন সম্মতি জানিয়ে ভেতরে চলে যায়। ড্রয়িং রুম থেকে বেরোতেই দেখে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে শেলী।

—আন্টি আপনাকে ডাকেনি। আমিই আন্টির নাম করে দুই বুড়োর কাছ থেকে আপনাকে বার করে আনলাম। আন্টির সাথে আমার কথা হয়ে গেছে। চলুন আমরাও আন্টির সাথে বেরোবো। আন্টি মার্কেটিং করবে আর আমরা একটু বেড়িয়ে আসবো। আপনি তো কালকেই বাইরে যাচ্ছেন। অনেক দিন তো দেখা হবে না।

শেলীর কথায় আবদার মেশানো। তপন অনেক কষ্টে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপে। ইতিমধ্যে সীমা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ওরা তিনজনে গাড়ি বারান্দার দিকে এগোতে থাকে। তপন বলে—বৌদি, মিঃ বোহরা দু'কাপ কফির কথা বলেছিলেন।

—তুমি বলার আগেই আমি ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এতক্ষণে বোধ হয় ওদের ঘরে কফি পৌঁছে গেছে। হ্যাঁ শোন, আমাকে নিউ মার্কেটে পৌঁছে দিয়ে তোমরা গাড়ি নিয়েও যেতে পারো। কিন্তু ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ফিরে আসতে হবে।

—আন্টি, মেক ইট টু আওয়ার্স প্লিজ। শেলী আদুরে গলায় বলে।

হেসে ওঠে সীমা। হাসতে হাসতে বলে—আচ্ছা, দু' ঘণ্টাই দিলাম। ওরা তিনজনে গাড়িতে এসে ওঠে। তপন একটা সিগারেট ধরায়।

সেদিকে একবার আড়চোখে চেয়ে শেলী বলে—আন্টি, তোমার গাড়িতে একটা বোর্ড লাগিয়ে দিও তো 'স্মোকিং প্রহিবিটেড'।

তপন সীমার উদ্দেশ্যে বলে—বৌদি, কারুর যদি অসুবিধা হয়, আমি না হয় সিগারেটটা ফেলেই দিচ্ছি। তপন সিগারেটটা বাইরে ফেলার ভান করতেই শেলী তাড়াতাড়ি হাতটা চেপে ধরে। সীমা হো হো করে হেসে ওঠে। শেলী লাজুক হেসে হাতটা ছেড়ে দেয়।

লঘু এবং মিষ্টি পরিবেশের মধ্যে গাড়ি এসে নিউ মার্কেটে পৌঁছোয়। সীমা বলে—তাহলে মনে থাকে যেন দু' ঘণ্টার এক মিনিটও বেশী নয়। তপন, তোমার ওপর দায়িত্ব রইলো। ও পাগলীর তো কিছুই খেয়াল থাকবে না। বিশেষ করে তোমাকে যখন পেয়েছে।

—আন্টি……তুমি ভারী অসভ্য। চোখে মুখে খুশীর ঢেউ তুলে শেলী প্রতিবাদ জানায়।

—গাড়ি নিয়ে কি হবে আমরা বরং হেঁটেই ঘুরি। কি মিস ট্যাণ্ডন, আপনার আপত্তি নেই তো?

শেলী মাথা নেড়ে জানায় ওর কোন আপত্তি নেই।

—ঠিক আছে দু'ঘণ্টা পরে তোমরা ঠিক এখানে চলে আসবে। সীমা নিউ মার্কেটে ঢুকে পড়ে।

শেলী আর তপন পায়ে পায়ে গড়ের মাঠের দিকে এগোতে থাকে

—আপনার ভাই কেমন আছে তপনবাবু?, শেলীর প্রশ্নে চমকে ওঠে তপন। কোন জবাব না দিয়ে হাঁটতে থাকে। ওর মনে তখন অনেক রকম এলোমেলো চিন্তা। শেলীর সাথে তপনের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। আজকে সেই কথাটাই সে শেলীকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবে।

—অ্যাই তপনবাবু, কি ভাবছেন বলুন তো? ভাই কেমন আছে?

—শেলী. তোমাকে একটা কথা বলবো।

শেলী তাকায় তপনের দিকে। ওর দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নতার ছায়া। ধীর অথচ গম্ভীর গলায় ও বলে—বলুন।

চারি-পাশের মৃদু বাতাসে একটা নিশ্বাস মিশিয়ে তপন বলে—শেলী তোমার সহজ সরল ভালবাসাকে আমি দারুণ শ্রদ্ধার চোখে দেখি। অথচ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক হতে পারে না। আমি তোমার

যোগ্য নই। তুমি জীবনে দারুণ ভুল করবে। তাই বলছি আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। শেলী যেন তপনের কথাগুলো বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় নেয়। তারপরেই তপনের মুখোমুখি দাঁড়ায়।—এ প্রশ্নটা আমার মাথায়ও এসেছিল। ভালই হয়েছে আপনি নিজেই তুলেছেন। আপনি অন্য একটি মেয়েকে ভালবাসেন এই তো?

—না শেলী, না। আমি কাউকে ভালবাসি না। আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ অন্য।

শেলীর উত্তেজনা প্রশমিত হয়। শান্ত চোখের চাহনিতে জিজ্ঞাসা করে—তাহলে আর কি কারণ থাকতে পারে?

কিছুক্ষণ নীরবতা। ওরা আবার হাঁটতে থাকে। দুজনের মনেই তখন নানান প্রশ্নের উঁকিঝুঁকি। একটা নাটক যেন যবনিকার দিকে এগিয়ে চলেছে। শেলী আবার বলে—বলুন আর কি কারণ থাকতে পারে?

—শেলী, তুমি তো জান আমি মিঃ বোহরার আণ্ডারে চাকরি করি। বেকারত্বের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের একটা ছেলে চাকরির বিনিময়ে নিজেকে সম্পূর্ণ তুলে দিয়েছে মিঃ বোহরার হাতে। আমার ব্যক্তিগত জীবনটাও মিঃ বোহরার নির্দেশে বাঁধা। আমার জীবনের সবটুকু সময় আমি ওঁর কাছেই বিকিয়ে দিয়েছি। তা ছাড়া আমি যা রোজগার করি তা দিয়ে···

খিলখিল করে হেসে ওঠে শেলী। হাসতে হাসতে বলে—তুমি যে এত ছেলেমানুষ তপন, আমি ভাবতে পারিনি। তোমার আগেই এসব বিষয় আমার ভাবা হয়ে গেছে। শুধু একটা জায়গায় আমার খটকা ছিল, তুমি অন্য কোন মেয়েকে ভালবাস কিনা। শোন, আমার বাবা বম্বেতে একটা বিলিতী কোম্পানিতে খুব ভাল চাকরি করতেন। তারপর হুইলার অ্যাণ্ড স্মিথ কোম্পানির পার্টনার হিসেবে ওই কোম্পানিতে জয়েন করেন। কলকাতা সম্বন্ধে বাবার একটা দুর্বলতা ছিল। কেন না আমার মা ছিলেন কলকাতার মেয়ে। বছরের একটা দিন হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও বাবা কলকাতায় আসতেন। একটা চার্চে সারাদিন কাটাতেন। বড় হয়ে জানলাম ওই চার্চেই বাবা আর মায়ের বিয়ে হয়েছিল। আর ওই নির্দিস্ট দিনটা বাবার বিয়ের দিন। যাই হোক আমি বাবার একমাত্র মেয়ে,

সুতরাং বাবার সব কিছু আমারই প্রাপ্য। তাই বলছি টাকা পয়সার অভাব আমাদের হবে না। তা ছাড়া তোমার সম্বন্ধে বাবার ধারণাও খুব উঁচু। বাবার কোম্পানিতে জয়েন করতেও তোমার কোন অসুবিধা নেই। ভাল চাকরি পেলে নিশ্চয়ই মিঃ বোহরা তোমাকে ছাড়তে আপত্তি করবেন না। দরকার হলে আমি না হয় আঙ্কেলের পায়ে ধরে তোমাকে চেয়ে নেবো। এবার বলো তোমার আর কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ নেই তো?

শেলী তপনের একখানা হাত নিজের বুকে তুলে নেয়। তপন তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে শেলীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নেয়।

—তবু আমি তোমার ভালবাসার যোগ্য নই শেলী। কেন তুমি আমার জন্য এত কিছু করবে? তোমাকে বিয়ে করার জন্য কত উচ্চশিক্ষিত ছেলেরা আসবে। যারা সম্মানে, অর্থে, প্রতিপত্তিতে আমার চেয়ে অনেক বড়। আমি কি পারি সেই সৌভাগ্য থেকে তোমাকে ছিনিয়ে আনতে? প্লীজ শেলী, আমাকে ভুলে যাও।

—একদম বাজে কথা বলো না। তোমার জীবনে অন্য কোন মেয়ে নেই এই কথাটা যদি সত্যি হয়, তবে অন্য কোন বিষয় নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি জান না তপন, একটা মেয়ে ইচ্ছে করলে কি করতে পারে।

তপন বুঝতে পারে কি এক দুর্বলতা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। হঠাৎ নিজেকে যেন চাবুক মেরে চাঙ্গা করে নেয়। উত্তেজিতভাবে বলে—তুমি কি চাও আমি ঘরজামাই হয়ে থাকবো? আমি গরিব হতে পারি, কিন্তু আমারও তো একটা আত্মসম্মান আছে।

—বেশ তো, আমি না হয় তোমার আত্মসম্মানকেই মেনে নেবো। তপন, আমার মা-ও বিরাট ধনী ঘরের মেয়ে ছিলেন। বাবা প্রথম জীবনে মোটেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু বাবা মাকে আজও ভুলতে পারেননি। কেন জান? মায়ের অকৃত্রিম ভালবাসার জন্য। আমিও সেই মায়েরই মেয়ে। আমাকে তুমি দারিদ্র্যের ভয় দেখিও না।

তপন স্তব্ধ। আচ্ছন্নের মতো শুধু বলে—তবু আমাকে একটু সময় দাও শেলী। নিজের সাথে একটু বোঝাপড়া করে নিই। চলো দু'ঘণ্টা হয়ে গেছে। মিসেস বোহরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

শেলী আস্তে আস্তে চলতে থাকে। অস্ফুট স্বরে বলে—তোমার অন্য কোন অসুবিধা থাকলে আলাদা কথা। তবে তোমাকে আমি মনেপ্রাণে ভালবাসি। জীবন দিয়ে চেষ্টা করতাম তোমাকে সুখী করতে।

ওরা দুজনে নিউ মার্কেটের দিকে এগোতে থাকে। আবছা অন্ধকারেও যেন শেলীর মুখখানা উজ্জ্বল দেখায়। দুজনের মাঝখানে শব্দহীন মুহূর্ত গড়িয়ে চলে। শেলীর মধ্যে যেন কোন চঞ্চলতা নেই। ধীর পায়ে ও হাঁটছে মুখ নীচু করে। তপন আড়চোখে একবার দেখে. বাতাসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস মেশে।

সীমা ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওরা তিনজনে গাড়িতে ওঠে। গাড়ি চলতে থাকে। তপন ভাবছে মিঃ বোহরার কথাগুলো "ধরা দিয়েও দেবে না।" তারই মধ্যে ভেসে ওঠে মিলনের মলিন মুখখানা। সীমা ওদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে—কি গো, তোমাদের ঝগড়া হলো নাকি?

—কি মিঃ দাশগুপ্ত আমাদের ঝগড়া হয়েছে? শেলী সহজ হবার চেষ্টা করে।

—তোমার সাথে কেউ ঝগড়া করে? আমি কি অতই বোকা? তপন মিথ্যা করে হাসে।

সীমা দুটো চকোলেট বার করে ওদের হাতে দেয়। শেলী সঙ্গে সঙ্গে মোড়ক খুলে খেতে আরম্ভ করে।

তপন হাতে নেয় কিন্তু মোড়ক খোলে না। শেলী জিজ্ঞাসা করে—আপনি চকোলেট খাবেন না?

—পরে খাবো। তপনের সংক্ষিপ্ত জবাব।

গাড়ি চলছে সি. সি. এর দিকে। ভেতরে তিনজনে তিন রকম ভাবনায় বিভোর। সীমা ভাবে কি মিথ্যে ওদের ভালবাসা। একটু অনুকম্পা জাগে শেলীর জন্য। কেন না তপনরা ভালবাসার অভিনয় করতে পারে, কিন্তু ভালবাসার কোন অধিকার নেই। অন্যদিকে তপন, শান্তর মতো হ্যাণ্ডসাম ছেলেদের সাথে ঘুরতে সীমারও মন চায়। মাঝে মাঝে মনে হয় ওদের মতো সুন্দর যুবকদের অপরাধের পথে নামিয়েছে তার স্বামী। প্রায়শ্চিত্ত করবে নাকি সীমা? তিনজনেই

চুপচাপ, যেন কেউ কাউকে চেনে না। নিঃশব্দ পরিবেশ ভাঙ্গার ভয়ে যেন কেউ কথা বলছে না।

—এই শেলী, কি ভাবছো বলো তো? সীমা নীরবতা ভেঙ্গে প্রশ্ন করে।

—ভাবছি ওপর থেকে যেটা সহজলভ্য মনে হয়, আসলে তা কত দুর্লভ। তাই না আন্টি?

শেলীর কথার জবাব দেবার আগেই গাড়ি পৌঁছে যায় সি. সি. এর গাড়ি বারান্দায়। ওরা দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ বোহরা এবং মিঃ ট্যাণ্ডন।

॥ একুশ ॥

ব্যস্তভাবে পায়চারি করছেন মিঃ বোহরা। সুধীর হালদারের আসবার কথা অথচ এখনও এলো না। মিঃ বোহরার চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। কোন অঘটনের আশঙ্কা করছেন তিনি। সামনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তপন। তাকে গোবরডাঙ্গায় যেতে হবে। সঙ্গে থাকবে সুধীর হালদার।

—ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না তপন। সুধীর তো কখনও কথার খেলাপ করে না? অসুখ-বিসুখ হলে অন্ততঃ একটা খবর দিতে পারতো। যদি কোন অ্যাকসিডেন্ট……আবার খানিকক্ষণ পায়চারি করেন মিঃ বোহরা। চোখে মুখে উৎকণ্ঠার অভিব্যক্তি। অগত্যা তপনকে একাই রওনা হতে হয়।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে তপন পৌঁছে যায় গোবরডাঙ্গায়। প্রায় আড়াই ঘণ্টার পর। স্টেশন থেকে বাড়ি খুব দূরে নয়। রিকশা করে নির্দেশ মতো পৌঁছে যায় একটা বাড়ির সামনে।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভেতরে আলো জ্বলছে। মনে মনে একবার আউড়ে নেয় বাবার নাম সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আর নিজের নাম শৈবাল ভট্টাচার্য। কড়া

নাড়ে। দরজা খুলে যায়। তপন দেখে ওর সামনে লাল পাড় শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে এক মাতৃমূর্তি।

—আমি শৈবাল। প্রণাম করে তপন।

—তোমার দুপুরে আসবার কথা ছিল না? আমি তো দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তপনের চিবুক ছুঁয়ে হাতখানা ঠোঁটে ছোঁয়ান হাসি দেবী। তপন শৈবাল হয়ে ভেতরে ঢোকে। হাসি দেবী ওকে ওর ঘর দেখিয়ে দেন।

—বাবার সাথে একবার দেখা করতে চাই। এক ঝলক করুণ হাসি ছড়িয়ে পড়ে হাসি দেবীর মুখে।

—এসো. উনি পাশের ঘরেই আছেন।

ওরা পাশের ঘরে ঢোকে। একজন প্রবীণ ভদ্রলোক ইজিচেয়ারে শুয়ে সান্ধ্যনিদ্রা উপভোগ করছিলেন। ওদের ঢুকতে দেখে সোজা হয়ে বসেন। তপন প্রণাম করে। বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলেন—কলেজ ছুটি? না ছুটি নিয়ে এলে?

তপন এক মুহূর্তের জন্য থমকে যায়। তারপরেই সহজভাবে বলে, ছুটি নিয়ে এলাম। দুজনেই দুজনের অভিনয়ে হেসে ওঠে। ওদের দিকে করুণ চোখে চেয়ে থাকেন হাসি দেবী। ওঁর মুখে কোন হাসি নেই।

—শৈবালকে চা জলখাবার দাও। যাও শৈবাল, তুমি বিশ্রাম করো। কাল সকালে তোমার সাথে কথা হবে।

শৈবাল নিজের ঘরে ঢোকে। হাসি দেবী রান্নাঘরের দিকে যান। জামা-কাপড় ছেড়ে টেবিলে এসে বসতেই শৈবালের সামনে খাবার এবং চা নিয়ে দাঁড়ান হাসি দেবী।

—ধন্যবাদ। শৈবাল হাসি মুখে বলে।

—মাকে কেউ ধন্যবাদ জানায়? শৈবালের প্লেটের দিকে বাড়ানো হাতখানা একবার থমকে যায়। ও একখানা টোস্ট তুলে মুখে দেয়। হাসি দেবীর একখানা হাত উঠে আসে শৈবালের মাথায়। উনি চুলে হাত বোলাতে থাকেন। শৈবালের ভেতরটা এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে ওঠে।

—আমি কিন্তু তোমাকে খোকা বলে ডাকবো।

—তাই ডাকবেন।

—আপনি নয়, তুমি। মাকে সবাই তুমি করে ডাকে। যদিও আমি তোমার আসল মা নই। তবু সবার চোখে তুমি আমার পেটের ছেলে। যাই হোক, রাত্রে কি খাবে? রুটি না ভাত?

—বাবা কি খাবেন?

—ভাত।

—তাহলে আমাকেও ভাত দিও। তোমাকে আর দুবার করে খাটতে হবে না।

শৈবালের ছোট্ট কথায় হাসি দেবীর বুকে কিরকম তোলপাড় হয় দুহাতে মুখ ঢেকে বলে ওঠেন—কেন তুমি আমাকে এভাবে কাঁদাচ্ছো দয়াময়? ওর মধ্যে যে আমি আমার নিজের ছেলের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি। দুদিনের এই খেলায় ছেলে কেন দিলে? কেন, কেন, কেন?

একখানা হাত এসে স্পর্শ করে হাসি দেবীর কাঁধে। এ হাতের ছোঁওয়া হাসি দেবীর চেনা। চোখে জল নিয়ে অনিমেষ চক্রবর্তীর বুকে মাথা রাখেন হাসি দেবী। সমবেদনার সুরে অনিমেষ বলেন—আমি জানি তোমার কোথায় ব্যথা। আমার দিকে চেয়ে দেখ, অনেক ছেলের বাবা হয়েও আমি পুত্রহীন। সাজানো ছেলেকে দেখে আক্ষেপ করছো নিজের ছেলে নেই বলে। কিন্তু হাসি, পেটের ছেলেও তো তোমাকে অবহেলা করতে পারতো। তোমাকে হয়ত আরও ব্যথা দিতো। তার চেয়ে এই ভালো। আমাদের খেলাঘরের সংসার। ইতিমধ্যে হাসি দেবী নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছেন। বৃদ্ধ আবার নিজের ঘরে ফিরে আসে।

শৈবালের কৌতূহলী কান হাসি দেবীর আক্ষেপ থেকে বৃদ্ধের সান্ত্বনা পর্যন্ত সব শুনেছে। অন্যমনস্ক ভাবে সাজানো বাবা মায়ের পরিচয়ে এক বিচিত্র জগতের সন্ধান পায়। পুত্রহীনা হাসি দেবী যেমন অতি সহজেই শৈবালকে আপন করে নিয়েছেন, ঠিক তেমনি মাতৃস্নেহহারা তপনও সেই স্নেহস্পর্শে সাড়া না দিয়ে পারেনি। তপন ডুবে যেতে থাকে অতীত চিন্তায়।

সেদিনের সেই দুরন্ত ন্যাংটো ছেলেটাকে স্নান করাতে গিয়ে মা হিমশিম খেয়ে যেতো। মায়ের ভয় দেখানোর একটাই কথা ছিলো—

"দুষ্টুমী করছিস তো, দেখিস আমি ঠিক মরে যাবো।" তপু ছুটে এসে জড়িয়ে ধরতো মাকে। মিষ্টি হেসে মা চান করিয়ে দিতো তপুকে। দুপুরে মায়ের কোল ঘেঁষে শুয়ে তপুর কিছুতেই ঘুম আসতো না। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর মা নিশ্বাস বন্ধ করে মরে যাবার ভান করতো। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠতো তপু। তারপর এক সময় সত্যি ঘুমিয়ে পড়তো।

তারপর একদিন মা সত্যি মরে গিয়েছিল। শ্মশানে মাকে পোড়াতে দেখে তপু চিৎকার করে উঠেছিল। বড়রা চেপে ধরে রেখেছিল তপুকে। এরপরে তপু আর কোনদিন দুষ্টুমী করেনি। তার বদলে দিনের পর দিন ও হয়ে উঠতে লাগলো জেদী আর অভিমানী। ওর কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে বাবাও মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে যেতো। তারপর থেকে শ্মশানে মড়া পুড়তে দেখলেই তপনের মায়ের কথা মনে পড়তো। দীর্ঘ অনেকগুলো বছর পার হয়ে যাবার পর বাস্তবের সাথে দিনরাত যুদ্ধ করতে করতে মা একসময় হারিয়ে গেল। এত বছর পরে হাসি দেবীর ছোঁওয়ায় আবার মায়ের কথা মনে পড়ছে। সেই হাসিমুখ "দুষ্টুমী করছিস তো, দেখিস আমি ঠিক মরে যাবো।" ঝাপসা হয়ে আসে তপনের দৃষ্টি। মনে মনে বলে—মাগো, কেন তুমি আবার এলে? আমি যে এখন পৃথিবীর একটা নোংরা কাজে নেমেছি। দেখ তোমার তপু এখন জঘন্য কাজে লিপ্ত এক অপরাধী। মাগো তুমি চলে না গেলে কি আমি এ কাজ করতে পারতাম? হারিয়েই যদি গেলে তবে আবার এলে কেন? বলো কেন এলে?

—শৈবাল! গম্ভীর স্বরে নামটা কানে আসতেই তপন ঝাপসা দৃষ্টিতে বৃদ্ধকে দেখতে পায়।

—বলুন।

—না কিছু না। দেখছিলাম কি করছো। তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো।

বৃদ্ধ ধীরপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। আর সেই মুহূর্তে তপনের মনে পড়ে সে শৈবাল। যে তপুর কথা সে ভাবছিল, মায়ের মৃত্যুর সাথে সাথে সেও মারা গেছে। অপরাধ হলেও এটাই তার কাজ।

শক্ত চোয়ালে আত্মসমীক্ষার পথ ছেড়ে সে আবার শৈবাল ভট্টাচার্যে ফিরে আসতে চেষ্টা করে।

ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বোলায়। পাল্লাহীন দেওয়াল আলমারি। অনেক বই সাজানো। ধূসর বেডকভারে বিছানাটা আগাগোড়া ঢাকা। দেওয়ালে একটা ছবিহীন ক্যালেণ্ডার। দূর থেকে এক হুলুধ্বনি ভেসে আসে। তার মানে আজ বৃহস্পতিবার। লক্ষ্মীপুজোর হুলুধ্বনি। শৈবাল বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। আবছা অন্ধকার ছড়ানো উঠোন। সামনে একফালি রাস্তায় কোনরকমে একটা রিকশা ঢুকতে পারে। কোনাকুনিভাবে দাঁড়ানো লাইট-পোস্টে আলোটা যেন ঝিমুচ্ছে।

দরজা দিয়ে ঢুকলো একটি মেয়ে। ফ্রক পরা। হাতে একটা রেকাবী। বোঝা যায় লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ। শৈবালকে এড়িয়ে মেয়েটি পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ে। ওদিক দিয়েও রান্নাঘরে যাবার একটা পথ আছে। শৈবাল বোঝে তার সাজানো বাবা-মা মাসখানেক আগে এসে পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে বেশ আলাপ পরিচয় করে নিয়েছে। খানিকটা দূরেই একটা জাহাজ প্যাটার্নের বাড়ি চোখে পড়ে। বাড়িখানার দিকে তাকালেই মালিকের সংগতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রিকশায় আসবার সময় ওই বাড়ির জানালায় সে একটি মুখ দেখেছিল! এক ঝলক চাহনিতে সে বোঝেনি মেয়েটি বিবাহিতা কি না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সে শৈবাল ভট্টাচার্য। একজন অধ্যাপক। সুতরাং তার গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলা উচিত। মিঃ বোহরার সেই রকমই নির্দেশ আছে।

—প্রসাদ নিন। দ্বিধাজড়িত একটি স্বর কানে আসতেই শৈবাল পেছন ফিরে চায়। সেই ফ্রকপরা মেয়েটি। শৈবাল হাত বাড়িয়ে দেয়। আলতো করে দু'টুকরো আপেল আর কলা দেয় মেয়েটি।

—তোমার নাম কি?

—স্মৃতি চট্টোপাধ্যায়।

—বাঃ বেশ সুন্দর নাম তো?

—আপনার নামটাও তো সুন্দর।

—তুমি আমার নাম জান নাকি? হেসে ওঠে শৈবাল।

—হ্যাঁ, মাসীমার মুখে অনেকবার শুনেছি। আমি যাই, আবার কাল আসবো।

মেয়েটি প্রায় ছুটে বারান্দা থেকে নেমে যায়। রান্নাঘর থেকে হাসি দেবীর রান্নার আওয়াজ আসছে। শৈবাল নিজের ঘরে ফিরে আসে।

বইয়ের তাক থেকে একখানা বই টেনে নেয় শৈবাল। কি সুন্দর প্রস্তুতি। তাকে সাজানো বই। বিছানা, টেবিল-চেয়ার। অধ্যাপক ছেলের ঘর সাজাতে মা ত্রুটি রাখেনি। এখন সবকিছু নির্ভর করছে শৈবালের ভূমিকায় তপনের নিপুণ অভিনয়ের ওপর। তাকে সাজানো শেক্স্‌পীয়র, মম, ফ্লবেয়ার, মোপাসাঁ। তার পাশে শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ। নীচের তাকে শঙ্কর, সুনীল গাঙ্গুলী ইত্যাদি।

তপনের কোনদিন বই পড়ার নেশা ছিল না। এখন তাকে বই পড়েই সময় কাটাতে হবে। সে যে শৈবাল ভট্টাচার্য। পেশা অধ্যাপনা।

সময় কাটানোর জন্য মোপাসাঁর ছোট গল্পের বইখানা পড়তে পড়তে শৈবাল যেন সত্যিই গল্পের মধ্যে ডুবে যায়। একাগ্রতা ভাঙ্গলো হাসি দেবীর ডাকে—রান্না হয়ে গেছে। খেতে এসো খোকা। বইখানা সরিয়ে রেখে শৈবাল বিছানা ছেড়ে ওঠে। আড়মোড়া ভাঙ্গে। এতক্ষণে মনে হয় সে সত্যিই ক্লান্ত। রান্নাঘরেই দু'খানা জায়গা পাশাপাশি। বাবা সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আর ছেলে শৈবাল খেতে বসেছে। পরিবেশন করছে মা হাসি দেবী। রান্নাঘরের পেছন থেকে ভেসে আসছে একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক।

—তুমি তমলুক কলেজের বাংলার অধ্যাপক শৈবাল ভট্টাচার্য। প্রয়োজন ছাড়া তোমার এই পরিচিতি কাউকে জানানো হবে না। তোমাকে বললাম এইজন্য যে বাবা আর ছেলের স্টেটমেণ্ট যেন আবার দু'রকম হয়ে না যায়।

শৈবাল খেতে থাকে। কোন জবাব দেয় না। মায়ের যেন এসব কথায় কোন আগ্রহ নেই। নিস্পৃহ ভাবে এটা ওটা গোছাতে থাকে।

—এখানে অনেক কলেজে পড়া মেয়ে আছে। তারা বাংলার কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এলে আমরা অবশ্য যথাসাধ্য বাধা দেবার চেষ্টা করবো। তবু তুমিও বিশ্রামের নাম করে এড়িয়ে যাবে।

কথা কম বলে গাম্ভীর্য বজায় রাখা যেন শৈবালের এখন থেকেই আরম্ভ

হয়ে গেছে। চুপচাপ খেয়েদেয়ে উঠে পড়ে। মোপাসাঁর সিগন্যাল গল্পটা পড়ে শেষ করে ফেলে। একটি গণিকার ইঙ্গিত নকল করার কৌতূহল একটি গৃহবধূকে কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছিল। শৈবাল ভাবে সাহিত্যের মধ্যেও কি অদ্ভুত জীবনের ছোঁওয়া। একজন অপরাধীর কথা শুনে চলতে চলতে তপনও শৈবাল হয়ে গেছে। দেখা যাক শৈবালের জীবনটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

॥ বাইশ ॥

ডাঃ সান্যালকে কেমন যেন এক দুর্বোধ্য চরিত্র মনে হয় শান্তর। সোজাসুজি বাড়িতে আসতে বারণ করেন না, কিন্তু দু'চোখে সন্দেহের ছায়া দোলে। ওদিকে বেলার সাথে প্রেমের খেলায় অনেকখানি এগিয়ে গেছে শান্ত। বেলা এখন ওর জন্য অপেক্ষা করে। শান্তর আসার দিনগুলো এখন বেলার মুখস্থ। ডাঃ সান্যালের কাছে অপমানিত হবার ঝুঁকি নিয়েও শান্তকে আসতে হবে। কেন না কাজটা মিঃ বোহরার সাথে প্রায় চ্যালেঞ্জ করেই সে নিয়েছে।

মাঝদিয়া স্টেশনে নেমে হাঁটতে হাটতে চলছে শান্ত। এখন সে রূপক চক্রবর্তী। ডাঃ সান্যালের বাড়ির কাছাকাছি যেতেই দেখতে পায় দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে বেলা।

—আজ কিন্তু তোমার অনেক দেরি হয়ে গেল। বেলা অনুযোগের সুরে বলে।

—কি করবো বলো, ট্রেনের ওপরে তো আর আমার হাত নেই। দু' জায়গায় দাঁড়িয়েই প্রায় চল্লিশ মিনিট লেট।

শান্ত ভেতরে ঢুকে বসে। ডাঃ সান্যাল নিয়মমতো সকালেই বেরিয়ে গেছেন। বেলা তাড়াতাড়ি শান্তকে চা জলখাবার এনে দেয়।

—বাবা তোমাকে ভাল চোখে দেখেন না, কেন বলো তো ?

—জানি না বেলা। তোমাদের বাড়ি আসি, তোমার সাথে কথা বলি, এটা বোধহয় উনি চান না। নিজেকে উদাস করে দেবার চেষ্টা করে রূপক।

—কেন আমি কি এখনও নাবালিকা আছি নাকি ? কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ গাঢ় স্বরে বেলা আবার বলে—শোন রূপ, তোমাকে আমার কিছু কথা বলার আছে।

শান্ত ওরফে রূপক নিঃশব্দে ওর দিকে তাকায়।

—রূপ, তুমি জান না, আমি বিধবা!

রূপক চমকে ওঠার মতো চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়েও থেমে যায়। বেলা রূপকের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে। রূপকও যথাসম্ভব গম্ভীর-ভাবে কাপে চুমুক দিয়ে বলে—থামলে কেন বলে যাও!

—আমাকে তোমার ঘৃণা করতে ইচ্ছা করছে না ?

—ছিঃ বেলা, তুমি একথা বলতে পারলে ? মানুষের অনেক রকম দুঃখজনক ব্যাপার থাকতে পারে। কিন্তু এতে তো তার নিজের কোন হাত নেই। তাই বলে সে ঘৃণ্য হবে কেন ? তুমি নিঃসঙ্কোচে তোমার কথা বলো, আমি শুনবো।

চোখে টলটলে জল নিয়ে বেলা বলতে থাকে—জানি না আমার কথা শুনতে তোমার ভালো লাগবে কিনা। তবু আমাকে বলতেই হবে।

—বেলা, বন্ধু হিসেবে যখন মেনেই নিয়েছো তখন আমার কাছে তোমার এত দ্বিধা কেন ?

—যদি বলি তোমাকে হারাবার ভয়ে।

শান্ত মুখে কোন জবাব দেয় না। চেয়ার ছেড়ে উঠে বেলার মুখখানা নিজের বুকে চেপে ধরে আলতো করে ওর ঠোঁটে ঠোঁট রাখে।

—রূপ, দরজা খোলা। কেউ দেখে ফেলবে। লক্ষ্মীটি ছাড়ো।

—দেখুক গে, আমি কি কাউকে ভয় করি নাকি ?

—সত্যি বলছো তুমি কাউকে ভয় কর না ?

—একশ বার বলছি। তুমি যদি আমার পাশে থাকো পৃথিবীতে কাউকে ভয় পাবার তো কোন কারণ নেই বেলা!

—আমি তো তোমারই আছি। তুমি ভরসা দিলে সারাজীবন থাকবো। রূপ, তুমি বলো আমাকে ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে তুমি ভালোবাসবে না। কথা দাও তুমি শুধু আমার।

—কথা দিচ্ছি বেলা। এবার বলো। কি বলছিলে যেন…

—বছর চারেক আগে আমার বিয়ে হয়েছিল দুর্গাপুরের এক

ইঞ্জিনীয়ারের সাথে। অস্বীকার করবো না, আমাকে দারুণ ভালোবাসতো। অনেক কষ্ট করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে। আমিও আমার যথা-সর্বস্ব দিয়ে তাকে ভালোবেসেছিলাম। দুর্গাপুরেই কোয়ার্টার। সেখানে থাকতাম শুধু ও আর আমি। সারারাত আদর করেও ওর আশ মিটতো না। অফিসে বেরোবার আগেও আমাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়তো। ওর বিরাট লম্বা চওড়া চেহারার মধ্যে বাস করতো এক অবুঝ শিশু। ওর শিশুসুলভ কার্যকলাপ দেখে হাসিও পেতো আবার ভালোও লাগতো। আমাকে নিয়ে যে কি করবে ভেবে পেতো না।

আনমনা হয়ে বলতে বলতে বেলা যেন একটু দম নেয়। আবার বলতে থাকে—মাত্র ন' মাস আমাদের বিবাহিত জীবন। কিন্তু আমার মনে হয় যেন ন' দিনও নয়। যেদিন মারা গেল তার আগের দিন রাত্রে আমার সাথে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল। পরের দিন জলখাবার খেতে বসেও আমার সাথে কথা বলছে না। রাগারাগির কারণ বাপের বাড়ি আসা নিয়ে। জলখাবার খেয়ে যখন জুতো পরে বেরোবে আমি ওর পথ আগলে দাঁড়ালাম।

—আমাকে আদর করলে না?

—বাপের বাড়ির আদরই তো তোমার বেশী প্রিয়। আমার আদরে আর কি হবে?

—ঠিক আছে, আর কোনদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা বলবো না।

ও একটু হাসলো। তারপর পাশ কাটিয়ে হনহন করে বেরিয়ে চলে গেল। এক বুক অভিমান নিয়ে ও চলে গেল। আর ফিরলো না। ওর মৃতদেহ নিয়ে এলো অফিসের গাড়ি। সান্ত্বনা দিতে এলো অনেক বড় বড় অফিসার। বাপের বাড়ি আমি এলাম। এমনভাবেই এলাম, আর কোনদিন শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে হবে না। এর পরে অনেকেই আমার আবার বিয়ে দেওয়ার জন্য বাবাকে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু বাবার ওই এক কথা, "কপালে সুখ থাকলে প্রথমেই হয়, বার বার বিয়ে দিয়ে কি আর মেয়েকে সুখী করা যায়?" প্রথম প্রথম আমিও তাই ভাবতাম। বিয়েটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো। কখন শুরু হলো কখন শেষ হলো বুঝতেই পারলাম না। কিন্তু রূপ, আমিও তো একটা মানুষ!

—তোমার কোন সন্তান নেই বেলা ?

—না। এবার বলো রূপ, এখনও কি তুমি আমাকে ভালোবাসবে ?

—বরং আগের চেয়ে বেশী বাসবো বেলা। তোমার অকপট সত্যি কথা বলা শুনে তোমার ওপর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। এত কথা তো তুমি না বললেও পারতে।

—তা কি হয় ? তুমি আমাকে তোমার সারাজীবনের সাথী করে নেবে আর আমি তোমাকে মিথ্যে বলবো ?

—কিন্তু তোমার বাবা ? তিনি তো তোমার বিয়েতে রাজী হবেন না !

—রূপ, তোমার কথা ভেবে আমার কষ্ট হচ্ছে। তোমার তো নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে তুমি বরবেশে আসবে। চারিদিকে আলো, নহবতে সানাই বাজবে। কিন্তু আমাকে বিয়ে করলে তো বাবার অমতেই করতে হবে। কোন জাঁকজমক থাকবে না, সানাই, শঙ্খ, বাজনা কিছুই থাকবে না। থাক রূপ, তুমি বরং অন্য মেয়েকে বিয়ে করো।

—আমি তো আর জাঁকজমক-আলো-সানাই এদের বিয়ে করবো না; আমি চাই তোমাকে। বলো, তোমাকে পেতে গেলে কি করতে হবে ?

খুশিতে নেচে ওঠে বেলার দু'চোখ। দু'হাতে রূপকের মুখখানা ধরে বলে—কিচ্ছু করতে হবে না। তুমি শুধু আমাকে নিয়ে কালীঘাটে গিয়ে মায়ের পায়ের সিঁদুর আমার মাথায় ছুঁইয়ে দেবে। ব্যাস, আমি তোমার বউ আর তুমি আমার স্বামী।

—কবে যেতে চাইছো ?

—অমনি বললেই বুঝি যাওয়া যায় ? একটু গোছগাছ করে নিতে হবে না ?

—গোছগাছ তো দুটো শাড়ি আর ব্লাউজ। ও কলকাতা থেকে নিয়ে নিলেই হবে।

—না গো না। মেয়েদের অনেক খুঁটিনাটি জিনিস থাকে। যেগুলো সব সময় পুরুষদের বলা যায় না। তা ছাড়া বাবা বুড়ো মানুষ, একটু ব্যবস্থা করে যেতে হবে না ?

রূপক কৃত্রিম অভিমানের সুরে বলে—ঠিক আছে, তুমি তোমার বাবাকে দেখাশুনা করে যখন সময় হবে বলো, আমি আসবো। রূপক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

হঠাৎ কি যেন মনে হয় বেলার। রূপকের সামনে এসে দাঁড়ায়। জলভরা চোখ দুটো তুলে বলে—তোমরা কি আমাকে শুধু কষ্টই দেবে? ও ঠিক এমনি অভিমান করে চলে গিয়েছিল আর ফেরেনি। তুমিও চলে যাচ্ছো। আমি কিছুতেই তোমাকে যেতে দেবো না··· কিছুতেই না। দু'হাতে শক্ত করে রূপককে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে থাকে বেলা।

শান্ত ওর মাথায় হাত রাখে। সমবেদনার সুরে বলে—আমি বুঝতে পারিনি বেলা, আমার কথায় তুমি এতখানি আঘাত পাবে। আমাকে ক্ষমা করো। ডাঃ সান্যালের আসবার সময় হয়ে গেছে। এবার আমি যাই।

—না, তুমি যাবে না। বাবা এলে তার সামনেই আমি তোমাকে চান করে খেয়ে যাবার অনুরোধ করবো। তুমি দু' চার বার না না বলবে। আমার জোরাজুরিতে অগত্যা রাজী হবে। আর শোন, বাবা এলে ভান করবে যেন তুমি কিছুক্ষণ আগে এসেছো। কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে বেলা ভেতরে চলে যায়।

রূপক মনে মনে বলে—সাবাস শান্ত, মাছ টোপ গিলেছে, এবার খেলিয়ে তুলতে পারলেই বাজিমাৎ। রূপক ওষুধের লিটারেচারগুলো নাড়াচাড়া করতে থাকে। এমন সময় বাইরে রিকশার হর্ন শোনা যায়। কিছুক্ষণ পর ঘরে ঢোকেন মিঃ সান্যাল। শান্তকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান। শান্ত চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলে—যাক, আজ আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। মিস সান্যালের কাছে শুনলাম আপনার আসার সময় হয়ে গেছে। তাই অপেক্ষা করছি। যাই হোক আমার বিশেষ তাড়া নেই। আপনি বিশ্রাম করে নিন। তার পর কথা বলবো।

ডাঃ সান্যাল কোন কথা না বলে ভেতরে চলে যান। খানিক পরে ডাঃ সান্যাল জামা-কাপড় ছেড়ে ফিরে আসেন। এখন তাঁর অভিব্যক্তি আগের চেয়ে অনেক প্রসন্ন। রূপককে নানা রকম প্রশ্ন করেন। রূপকও যথাযথ উত্তর দেয়। এমন সময় এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে ঘরে ঢোকে বেলা।

—বাবা, সরবতটা খেয়ে নাও। (রূপকের দিকে চেয়ে) আপনি আর এত বেলায় কোথায় যাবেন! এখানেই স্নান সেরে দুটি খেয়ে নিন না!

—না-না তা কি হয়? রোদে ঘোরা আমার অভ্যাস আছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না মিস সান্যাল।

—ব্যস্ত হচ্ছি না। আমাদের জন্য যা রান্না হয়েছে তাই আপনাকে দেবো। ভর দুপুরে অতিথি অভুক্ত থাকলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়।

এই কথাটায় ডাঃ সান্যাল যেন একটু নরম হন। তিনি নিজেই বলেন—আপনার আপত্তি না থাকলে দুটো খেয়ে যান না। ও যখন এত করে অনুরোধ করছে। তা ছাড়া বাইরের আজেবাজে জিনিস খাওয়ার চেয়ে বাড়ির রান্না অনেক ভালো।

রূপক কোন কথা বলে না। ওষুধগুলো প্যাক করতে থাকে।

ডাইনিং-টেবিলে ডাঃ সান্যালের সাথে একসাথে খেতে বসে অনেক কথা বলে রূপক। ও লক্ষ্য করে ডাঃ সান্যালের চোখ থেকে সন্দেহের ছায়াটা যেন অনেকখানি কেটে গেছে। খাওয়ার পরেই আসে বিশ্রামের প্রশ্ন। বেলা যেন অনেকটা বাধ্য হয়েই বলে—আমাদের বাইরের ঘরে আপনার বিশ্রামের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। বিকেলে চা খেয়ে যাবেন। বাবা, তুমি তোমার ঘরে বিশ্রাম নাও।

ডাঃ সান্যাল নিজের ঘরে চলে যান। বেলা আর রূপকের মধ্যে এক চটুল দৃষ্টি বিনিময় হয়।

—সব কিছু নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিলে তো? রূপক প্রশ্ন করে।

—এটা প্রস্তুতি বলতে পার। এরপর তোমার সাথে পালিয়ে গেলে বাবা অথৈ জলে পড়বেন না। তোমার সাথে পালিয়েছি সেটুকু অন্ততঃ বুঝতে পারবেন।

বেলার পেতে দেওয়া বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে রূপক বলে—তোমাকে নিয়ে আমার এখনই পালাতে ইচ্ছে করছে।

—উঠবে কোথায়? একটা ঘর ঠিক করে নাও আগে। আমি তো আর তোমার মেসে গিয়ে উঠতে পারবো না?

—সে দায়িত্ব আমার বেলা। সেলস্‌ম্যানের চাকরি করি। ঘুরে বেড়ানোই আমার কাজ। সুতরাং তোমাকে নিয়ে যে জলে পড়বো না, সে গ্যারান্টি দিতে পারি। তুমি শুধু দিনটা ঠিক করে আমাকে জানাও। দেরি করো না প্লিজ!

কথা শেষ করে রূপক বেলার একটা হাত ধরে কাছে টেনে নেয়। বেলার উষ্ণ ঠোঁট নেমে আসে রূপকের ঠোঁটে। অস্ফুট স্বরে বেলা বলে—রূপ, কিছুটা রাখো, বিয়ের পর কি করবে?

॥ তেইশ ॥

অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন মিঃ বোহরা। চিন্তাক্লিষ্ট মুখের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট। মুখে একটা চুরুট। ভোর হয়ে গেছে। ট্রাম-বাসের ক্ষীণ শব্দের সাথে জেগে উঠছে কলকাতা। স্বচ্ছ নাইটি এলোমেলো। আলতোভাবে চোখ মেলে সীমা। স্বামীর দিকে তাকায়। অলসভাবে প্রশ্ন করে—কি এত ভাবছো?

—ভাবছি অনেক কিছু। সুধীর হালদার কোথায় গেল? অবশ্য ওর কাজ ও করেই দিয়ে গেছে। তবু···আবার পায়চারি করতে থাকেন মিঃ বোহরা।

সীমা চেয়ে থাকে স্বামীর দিকে। অবিচল প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় মুখ আজ চিন্তাক্লিষ্ট। পৃথিবীর কোন কাজই এর কাছে কঠিন নয়। আত্ম-বিশ্বাস এবং বুদ্ধির প্রখরতা কতখানি থাকলে একটি সুখী দম্পতির ভালোবাসাকে চ্যালেঞ্জ করে স্বামীর কাছ থেকে তার স্ত্রীকে ছিনিয়ে আনতে পারে। অথচ এর মধ্যে কোন বলপ্রয়োগ নেই। হঠাৎ সুরিন্দারের কথা মনে পড়ে। বেচারা! মদ আর মেয়েমানুষের লোভ সামলাতে পারলো না। সীমাকে কি ও সত্যিই ভালোবাসতো?

অথচ এই লোকটি? ইচ্ছে করলে অনেক মেয়েকেই শয্যাসঙ্গিনী করতে পারে। কিন্তু সেখানেও এক কঠিন চারিত্রিক দৃঢ়তা! অপরাধী হয়েও সীমার কাছে পরম বিশ্বাসী।

চুরুট মুখে অন্যমনস্কভাবে বেরিয়ে আসেন মিঃ বোহরা। নিঃশব্দে চোরাগলি ধরে এগিয়ে চলেন কুহেলির ঘরের দিকে। শান্ত ফিরে এসেছে মাঝদিয়া থেকে। বিশদ বিবরণ এখনও শোনা যায়নি। কোথায় যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত উঁকি দিচ্ছে মনের কোণে। তবে কি তপনের ব্যাপারে কোন গণ্ডগোল হলো? নানান চিন্তায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে যখন মিঃ বোহরা এগোচ্ছেন ঠিক সেই সময় একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ কানে আসে। মিঃ বোহরা দাঁড়িয়ে পড়েন একটা ঘরের কাছে। বীথির কাতরোক্তি। সব কিছু বুঝিয়ে বলার পরেও এই মেয়েটা কিছুতেই যেন বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে চাইছে না। না খেয়ে কান্নাকাটি করে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে ওকে অন্য কোথাও পাঠানোও বিপজ্জনক। মিঃ বোহরা আবার চলতে থাকেন!

কুহেলির ঘরের কাছাকাছি এসে একবার দরজায় কান পাতেন। না, কোন ষড়যন্ত্রের ফিসফাস আওয়াজ নেই। চোরা গর্ত দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে দেখেন শান্তর কোলে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমুচ্ছে কুহেলি। মিঃ বোহরার দু'চোখে হাসি খেলে যায়। ঠিক এই রকমই চাইছিলেন তিনি। সাবাস কুহেলি! নিঃশব্দে বারান্দার কোণায় গিয়ে কলিং বেলে হাত রাখেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমজড়িত চোখে উঠে আসে কুহেলি।

সুপ্রভাত বিনিময়ের পর মিঃ বোহরা বলেন—শান্তকে হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে তৈরি থাকতে বলো, আমি আধঘণ্টা পরে আবার আসছি। ওর সাথে কথা আছে। মিঃ বোহরা বিদায় নেন।

—কি বললো তোমার বস? শান্ত জিজ্ঞাসা করে।

—আধঘণ্টা পরে উনি আবার আসবেন। বোধহয় বেলা-পর্ব কতখানি এগোলো জিজ্ঞাসা করবেন।

—জানি। রিপোর্ট ভালোই হবে। আমি সাকসেসফুল।

সাকসেসফুল কথাটা কানে যেতেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায় কুহেলি। শান্তর সাকসেসফুল মানেই তো আরও একটি মেয়ের জীবনে অন্ধকার নেমে আসা। কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায় শান্তর দিকে। ওর ঋজু শরীরটা পাশ ফেরানো। দেওয়ালের দিকে চেয়ে শান্ত সিগারেট টানছে। ওর পাশে অন্য একটা মেয়েকে ভাবতেই বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবে, না, শান্তর ওপর দুর্বলতা নেহাৎ বোকামী। খানিকটা বাতাস বেরিয়ে আসে কুহেলির পাঁজর কাঁপিয়ে।

—ওঠো। হাতমুখ ধুয়ে নাও। আধঘণ্টা পরেই মিঃ বোহরা আসবেন।

ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে অগোছালো বেশবাস গোছাতে গোছাতে নিজেকে দেখে। শান্ত উঠে এসে পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরে। কুহেলি যেন একটা জড় পদার্থ। অন্যের খেয়ালখুশি মতো ব্যবহৃত হবে।

—তোমাকে দারুণ ভালো লাগে কুহু। শান্ত আবেগের সাথে বলে।

—এ কথাটা তো অনেক মেয়েকেই বলেছো। আমিও অনেক পুরুষের কাছেই ওই কথাটা শুনেছি। কি হবে এক কথা বার বার বলে ?

কে যেন চাবুক মারে শান্তকে। স্বতোৎসারিত আবেগের মুখে হঠাৎ যেন ছাই পড়ে। কুহেলিকে ছেড়ে দিয়ে শান্ত বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ কুহেলির মনে হয় সকাল বেলাই মানুষটাকে কটু কথা বলা ঠিক হলো না। হয়তো এটা ওর অভিনয়ের কথা নয়। অনেকগুলো রাত তো ওর সঙ্গেই কাটছে কুহেলির। কোন কোন রাত্রে কুহেলির বুকে মাথা রেখে কেঁদেছে শান্ত। শুনতে শুনতে কুহেলির চোখেও জল এসেছে। সেগুলো তো অভিনয় নয়। আবেগের বশে কুহেলিও যে দু'একটা প্রাণের কথা বলেনি, এমন নয়। কিন্তু বীথির ব্যাপারে শান্ত ভীষণ দুর্বল। আজ রাত্রে শান্তর সাথে দেখা করিয়ে দেবে বীথির। কুহেলি ওকে কথা দিয়েছে। সেইজন্যই কি শান্তর এত অভিনয়! কুহেলিকে নিয়ে এত বিহ্বলতা! আসলে বীথিকে কাছে পাওয়ার জন্যই কুহেলিকে এত আদর, এত প্রেম। একটা বিদ্বেষের সাপ ফুঁশতে থাকে কুহেলির বুকের ভেতর।

তোয়ালেটা মুখে চাপতে চাপতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরে ঢোকে শান্ত। নির্জন ঘরে কেমন একটা উদাসী আবহাওয়া। মনে মনে ভাবে —শালা যতই ভালোবাসা যাক্, বেশ্যা কখনও বউ হতে পারে না। অথচ এই কুহেলিই কাল রাত্রে শান্তর বুকে মাথা রেখে বলেছিল—জীবনটা তো এখানেই শেষ হয়ে গেল। এখন শুধু বিভিন্ন পুরুষের সাথে এক বিছানায় শুয়ে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া। যৌবন থাকা পর্যন্ত কোন ভাবনা নেই। তারপর ?

গভীর সমুদ্রের তলা থেকে যেন বুদ্বুদের মতো উঠে এসেছিল একটা কথা। শান্ত জবাব দিয়েছিল—তারপর আমি তোমাকে দেখবো কুহু! বুকের রোমগুলো উত্তেজনায় খামচে ধরেছিল কুহেলি। বিস্ময় মেশানো দৃষ্টিতে প্রশ্ন করেছিল—সত্যি বলছো তুমি আমাকে দেখবে ?

—কথা দিচ্ছি কুহেলি। এর মধ্যে কোন অভিনয় নেই।

এক নিশ্চিন্ত প্রশান্তিতে শান্তকে আঁকড়ে ধরেছিল কুহু। আর সকাল হতেই সব মিলিয়ে গেল ? অন্ধকার শেষ হতেই হারিয়ে গেল সব প্রেম ?

—তোমার চা আর জলখাবার। কুহেলি টেবিলের ওপর রাখে। শান্ত কুহেলির দিকে না তাকিয়েই একটা টোস্ট তুলে নেয়। চায়ের কাপে সবেমাত্র চুমুক দিয়েছে এমন সময় বেজে ওঠে কলিং-বেল। নিঃশব্দতার মধ্যে ঝন্ ঝন্ আওয়াজটা যেন মনের দরজায় ঘা দেয়।

ঘরে ঢোকেন মিঃ বোহরা। সুপ্রভাত বিনিময়ের পর বলেন—ওদিকে কি খবর বলো।

শান্ত আদ্যোপান্ত সব কিছু বলে এবং দু' একদিনের মধ্যেই যে বেলাকে এখানে আনতে পারবে সে বিষয়েও আশ্বাস দেয়। খুশীতে চোখের পাতা নাচিয়ে মিঃ বোহরা বলেন—ঠিক আছে, বেলাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে তুমি তপনের ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকবে। বেলাকে দেখাশোনা করার ভার নেবে কুহেলি। ও. কে. ?

—ঠিক আছে স্যার। ইতিমধ্যে মিঃ বোহরার জন্য এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢোকে কুহেলি।

—জান শান্ত, কুহেলি ইজ মাই অ্যাসেট। মিঃ বোহরা গর্বভরে বলেন —আমাদের এই স্কিমটা শেষ হয়ে গেলে কুহেলির জন্য কিছু একটা করতে হবে, যাতে সারাজীবন ওর চলে যায়। অবশ্য ও যদি বিয়ে থা' করে ঘর-সংসার করতে চায় তারও ব্যবস্থা করে দেবো।

শান্ত আর কুহেলি দুজন দুজনের দিকে তাকায়। সে দিকে একবার দেখে মিঃ বোহরা বলেন—অবশ্য তুমি যদি কুহেলিকে বিয়ে করতে চাও, তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই শান্ত। যাকগে, ওসব পরের কথা পরে ভাবা যাবে। তাহলে আজ বিকেলে তুমি একবার তপনের ফ্ল্যাটটা দেখে এসো।

—স্যার, আজ রাতটাও আমি কুহেলির কাছে থাকতে চাই। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

মিঃ বোহরার চোখে অর্থপূর্ণ হাসি। সংক্ষেপে বলেন—তাই হবে।

এমন সময় লিংকিং টিউবের আওয়াজ। ছুটে বেরিয়ে যায় কুহেলি ফিরে এসে বলে—মিঃ বোহরা, সুধীর হালদার ফিরে এসেছে। মিসেস বোহরা এক্ষুনি আপনাকে যেতে বললেন।

মিঃ বোহরা ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

গুপ্তঘরে সুধীর হালদারকে দেখে প্রাণ ফিরে পান মিঃ বোহরা

উত্তেজনায় তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন—কি ব্যাপার সুধীর? কোন খবর নেই, একেবারে নিখোঁজ?

চুল উসকো-খুসকো। সারামুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বিধ্বস্ত দৃষ্টিতে সুধীর বলে—আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর সাথে আমার চিরদিনের মতো বিচ্ছেদ হয়ে গেল স্যার। এই কলকাতা শহরে ও-ই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। ঘটনাচক্রে আমিই ওর কাছে বেইমান হয়ে গেলাম।

—তোমাকে আর ওখানে থাকতে হবে না সুধীর। আমাদের সবাইকার নিরাপত্তার জন্য তোমার থাকার ব্যবস্থা আমিই করে দেবো।

—স্যার, আমি সপ্তাহখানেক বিশ্রাম চাই। মনটা দারুণ খারাপ লাগছে।

—ঠিক আছে। বিশ্রাম নাও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে যেতে পারবে না। এক কাজ করো, শান্ত থাকছে তপনের ফ্ল্যাটে। তুমি শান্তর ফ্ল্যাটে কয়েকটা দিন থাকবে। সন্ধ্যে নাগাদ এখানে এসে আমার সাথে একবার দেখা করে যাবে। আমার মনে হচ্ছে কোথাও কোন একটা গোলমাল হচ্ছে। অবশ্য এটা আমার দুশ্চিন্তাও বলতে পার। কাল তুমি গোবরডাঙ্গায় গিয়ে তপনের খোঁজটা নিয়ে আসবে। ওর কোন খবর পাচ্ছি না।

—তপনদার সম্বন্ধে ভাববেন না স্যার। দারুণ বুদ্ধি। বেইমানী করলে আলাদা কথা। তা না হলে তপনদাকে কেউ ধরতে ছুঁতে পারবে না।

মিঃ বোহরা হাসেন। সুধীর হালদার বিদায় নেয়।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে মিঃ বোহরা শান্তকে ডেকে পাঠান। শান্ত এলে উনি একটা চাবি এগিয়ে দিয়ে বলেন—তপনের ফ্ল্যাটে তো এর আগে কোনদিন যাওনি। একবার ঘুরে এসো।

কুহেলির ঘরে ফিরে এসে পোশাক পাল্টে শান্ত বেরিয়ে পড়ে। ঠিকানা অনুযায়ী ফ্ল্যাট খুঁজে বার করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। চাবি দিয়ে ঘর খোলে। ভেতরে আলো জ্বলছে। বেরোবার সময় তপন আলো নেভাতে ভুলে গেছে। কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর গরম। শান্ত তাড়াতাড়ি একটা জানালা খুলে দেয়। রাস্তার দিকের জানালা। বাইরে তাকায় শান্ত। নিরিবিলি পাড়া। একটা ট্যাক্সি আস্তে আস্তে চলে

গেল। দূরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার অস্পষ্ট আলোয় মনে হচ্ছে যেন শান্তর দিকেই তাকিয়ে আছে। শান্ত জানালার কাছ থেকে সরে আসে। ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে থাকে। খাটের নীচে অনেকগুলো সিগারেটের টুকরো। বেতের সোফাসেটে ধুলোর আস্তরণ। বাথরুমে ঢোকে। শুকনো খটখটে বাথরুম। বেসিনে হাতমুখ ধোয় শান্ত। ঝোলানো তোয়ালেতে হাত রাখতে গিয়েই আওয়াজটা শুনতে পায়। ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং কলিং-বেল বাজছে। কে হতে পারে? শান্ত বেরিয়ে এসে দরজার ম্যাজিক আইতে চোখ রাখে। যারা দাঁড়িয়ে আছে শান্ত ওদের কাউকে চেনে না। তবু দরজা খুলতে হয়।

—আপনি? তপন কোথায়?

—আপনাদের তো ঠিক...

—আমরা ওর বিশেষ বন্ধু। আমার নাম সুবীর আর ওর নাম তমাল।

—ও তো অফিসের কাজে একটু বাইরে গেছে। আমি ওর কলিগ। ফ্ল্যাট পাহারায় আছি।

—আচ্ছা ঠিক আছে। কবে ফিরবে বলতে পারেন?

—দিন কুড়ি-পঁচিশের আগে নয়।

—ধন্যবাদ। ও এলে আমাদের কথা বলবেন। ওরা চলে যায়।

দরজা বন্ধ করে শান্ত ভাবতে থাকে বন্ধু থাকা তো উচিত নয়। থাকলেও ফ্ল্যাট চেনানো উচিত হয়নি।

॥ চব্বিশ ॥

অলস সময় গড়িয়ে চলে। তপন এখন নিজেকে পুরোপুরি শৈবাল ভট্টাচার্যে রূপান্তরিত করে নিয়েছে। সারাদিন বাড়ির ভেতরে পড়াশুনার অজুহাতে থাকা। বিকেল হলেই যমুনা কিংবা ভাঙ্গর নদীর ধারে সময় কাটানো। কখনও সরকারী পোলট্রীতে ঘোরা।

দিনের অনেকটা সময় কাছে কাছে থাকে স্মৃতি। ওকে দেখলেই শৈবালের হাসি দেবীর কথা মনে পড়ে, "স্মৃতির দিদি গোপাই আমাদের টারগেট। গোপার ভাল নাম অঞ্জনা। অপূর্ব সুন্দরী।" ও মেয়েকে ঘরের বৌ করতে আপত্তি নেই হাসি দেবীর। পরক্ষণেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।—কেন তুই আমার সত্যিকারের ছেলে হলি না খোকা?

—আমিও তাই ভাবি কেন তুমি আমার সত্যিকারের মা হলে না! তুমি আমার মা হলে আমি কিছুতেই এই নোংরা কাজে নামতাম না। কুলিগিরি করতাম তবু...

ওদের কথার মধ্যে গুটি গুটি ঘরে ঢোকে অনিমেষ চক্রবর্তী, এই মুহূর্তে যে সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—অধ্যাপক শৈবাল ভট্টাচার্যের বাবা।

—একটু চেষ্টা করলে বোধহয় তোমাদের মা আর ছেলের স্বপ্ন সফল হতে পারে। বৃদ্ধের চোখে ঈষৎ হাসির ছোঁওয়া। সবই সম্ভব তবে বড় একটা ঝুঁকি নিতে হবে।

মা আর ছেলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। বৃদ্ধ আবার বলতে থাকেন—এখান থেকে তোমাদের স্রেফ কেটে পড়তে হবে। অনেক দূরে। তারপর সেখানে শৈবালকে একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিতে হবে। বছর দুই তিন যদি কোন রকমে কাটিয়ে দিতে পার। ব্যাস তাহলে আর ভাবনা নেই। কিন্তু তার আগে শৈবালকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, জীবনের সব পিছুটান উপেক্ষা করতে হবে। কেন না পালিয়ে যাবার পর তোমাদের দুটি প্রতিপক্ষ হবে। মিঃ বোহরা এবং পুলিস। পাঁচ-সাতটা বছর পরে দেখবে শুধু ভারতবর্ষ নয় গোটা পৃথিবীর চেহারাই পালটে গেছে। তখন তোমাদের নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাবে না।

ওরা এতক্ষণ বৃদ্ধের কথা শুনছিল। হাসি দেবী আস্তে আস্তে ওঠেন। যাবার আগে বলেন—বাবা ছাড়া কি আর মায়ের এত সুন্দর ছেলে হয়?

মাথায় কাপড় টেনে টুক করে ঘর থেকে বেরিয়ে যান হাসি দেবী। শৈবাল ওদের মিষ্টি প্রেম দেখে খুব মজা পায়।—আপনাদের দেখলে মনেই হয় মা সাজানো স্বামী-স্ত্রী।

—তাহলে আমরা পুরস্কার পাওয়ার মতো অভিনয় করছি বলো!

শৈবাল এবং সুরেন্দ্রনাথ দুজনেই একসাথে হেসে ওঠে। সুরেন্দ্রনাথ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে উদাস স্বরে বলেন—জানো, মেয়েছেলে হলো লতার মতো। একটা অবলম্বন না পেলে ওরা বাঁচতে পারে না। এই রকম এক একটা খেলা শেষে আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, তখন নিজেকে সত্যিই বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। মুখে না বললেও আমি জানি তোমার মা-ও সবার চোখের আড়ালে চোখের জল ফেলেন। আমার নিজের ছেলেরা প্রতিষ্ঠিত, অথচ তবু আমাকে হাহাকার করে ঘুরতে হয়। অবশ্য তোমার মা সত্যিই বঞ্চিতা। ওঁর কথা আমি তোমাকে বলতে চাই না। পার তো ওঁর মুখ থেকেই শুনে নিও। তবে তোমার মতো ছেলে আর ওঁর মতো স্ত্রী নিয়ে আমি যখন খেলাঘরের গৃহকর্তা সাজি তখন রোজ রাত্রে চোখের জলে ভগবানকে বলি—হয় তুমি আমার খেলাঘর সত্যি করে দাও, নয় আমাকে নাও। তোমার মত ছেলে থাকলে…বৃদ্ধ আর বলতে পারে না। ঘোলাটে চোখ থেকে ঝর ঝর করে জল পড়তে থাকে।

ইতিমধ্যে দু' হাতে দু' কাপ চা নিয়ে ঢোকেন হাসি দেবী। বৃদ্ধের সামনে একটা কাপ রাখেন। অন্য কাপটা শৈবাল হাত বাড়িয়ে নিয়ে বলে —তোমার চা কোথায় মা?

—দাঁড়া আনি। হাসি দেবী ফিরে যান। চা হাতে নিয়ে আবার ঘরে ঢোকেন। দুজনের দিকে একবার চেয়ে যেন সমস্ত পরিবেশটা বুঝে নেন। নিঃশব্দে কয়েকটা মুহূর্ত কাটে। এক সময় হাসি দেবী বলেন—আয় না খোকা, তোর বাবার কথা মতো আমরা তিনজনে পালিয়ে যাই। তোর বাবা আর আমার কাছে যা টাকা আছে তাতে মাস ছয়েক আমরা নুনভাত খেয়ে চালিয়ে দিতে পারবো। তার মধ্যে তুই একটা কিছু যোগাড় করে নিস।

স্তব্ধ হয়ে তপন খানিক তাকিয়ে থাকে হাসি দেবীর দিকে। হাসি দেবী আবার বলতে থাকেন—ভাবছিস কেন? আয় আমার বুকে আয় খোকা। তোকে পেটেই না হয় ধরিনি তাই বলে কি আমি তোর মা হতে

পারি না? তপনের মাথাটা বুকে চেপে ধরেন হাসি দেবী। ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে হাসি দেবীর দু'চোখ বেয়ে।

হাসি দেবীর বুকে মাথা রেখে তপনেরও গলার কাছে কি যেন দলা পাকিয়ে ওঠে। নিজেকে খানিকটা আত্মস্থ করে বলে—মা, এখানকার কাজ মিটলে তোমরা কোন তীর্থে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থেকো। আমি আমার প্রাপ্য টাকা পয়সা নিয়ে দেশের বাড়িতে একবার বাবার সাথে দেখা করে তোমাদের কাছে চলে যাবো।

হাসি দেবী দাঁড়িয়ে থাকেন পাথরের মূর্তির মতো। কোন কথা যেন ওঁর কানে যাচ্ছে না। তপন ডাকে—মাগো, আমি তোমার কাছেই থাকবো। তুমি এই ঠিকানায় আমায় চিঠি দিও। তপন সুবীরের ঠিকানা দেয়। হাসি দেবী চোখের জল মুছে ঠিকানা লেখা কাগজের টুকরোটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

বেলা পড়ে এসেছে। পাঞ্জাবি পাজামা পরে তপন অধ্যাপক সুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে বেরোবার জন্য তৈরি হয়। গেটের কাছে আসতেই ছুটে আসে স্মৃতি।

—আপনি রোজ নদীর পারে যান, না শৈবালদা?

—তুমি আসবে আমার সাথে? এসো।

—তাহলে দাঁড়ান, মাকে একটু বলে আসি। স্মৃতি ছুটে চলে যায়, আবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসে।—চলুন।

স্মৃতিকে নিয়ে তপন যমুনার পারে এসে বসে।

—আপনি তো বাংলার প্রফেসর। আপনাকে অনেক পড়াশুনা করতে হয় তাই না?

—তা তো একটু হয়ই।

—দিদি বলছিল আপনি নাকি পড়াশুনা ছাড়া কিছু বোঝেন না। দিদি সামনের বছর পার্ট টু পরীক্ষা দেবে।

স্মৃতির কথায় তপন একটু হাসে।—তাই বুঝি? দিদিকে বলো ভালো করে পড়াশুনা করতে।

—আপনি আসার আগে দিদি তো প্রায় সারাদিনই আপনাদের বাড়িতে থাকতো। মাসীমার সাথে দিদির খুব ভাব।

—আমি আসার পর আসে না কেন?

—লজ্জা পায়। বলে—ওরে বাবা, গেলেই তো উনি পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করবেন।

তপন স্মৃতির কথায় প্রাণ খুলে খানিকটা হাসে। তারপর নরম গলায় বলে—ঠিক আছে, দিদিকে আসতে বলো। আমি একটাও পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করবো না। আমি তো ছুটিতে এসেছি। তাই পড়াশুনা থেকেও ছুটি। শুধু খাওয়া বেড়ানো আর গল্প করা। দিদিকে বলো আমি তার সাথে শুধু গল্প করবো।

—আমি তো দিদিকে বলি আপনি আমার সাথে কত গল্প করেন—শুনে দিদি বলে, আমার সাথে কি আর তোর মতো গল্প করবেন শৈবালদা ?

তপন আবার হাসতে হাসতে বলে—দিদিকে বলো, শৈবালদা বাঘ ভালুক কিছু নয়। একদিন এলেই বুঝতে পারবে।

সন্ধ্যা নেমে আসে। ওরা বাড়ি ফিরতে থাকে। ওরা যখন গেটের কাছাকাছি গোপা ত্রস্ত পায়ে তপনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। স্মৃতি হেসে ওঠে—ওই দেখুন, আপনাকে দেখে কেমন পালিয়ে যাচ্ছে।

—ডাকো ডাকো।

—এই দিদি, তোকে শৈবালদা ডাকছেন।

দাঁড়িয়ে পড়ে গোপা। আস্তে আস্তে শৈবালের সামনে মুখ নীচু করে দাঁড়ায়।

—মায়ের কাছে আপনার কথা শুনি। আলাপ করার সুযোগ হয়নি। আপত্তি না থাকলে কাল সকালে আসুন না। চুপচাপ বসে থাকি, একটু গল্প করা যাবে। কাল তাহলে আসছেন তো ?

গোপা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। শান্তস্বরে বলে—চল স্মৃতি, বাড়ি চল।

—চলি শৈবালদা। স্মৃতি বলে।

সেই ফাঁকে গোপার সাথে শৈবালের চোখাচোখি হয়। ওরা এগিয়ে যায়। শৈবাল নিজের ঘরে ফিরে আসে।

ঘরে ঢুকেই দেখে হাসি দেবী ক্রুস কাঁটা দিয়ে একটা লেস বুনছেন। তপন পাঞ্জাবি খোলে।

—গোপার সাথে আলাপ হলো ?

—হ্যাঁ, একটু আলাপ করার চেষ্টা করলাম।

তপনের দিকে না চেয়ে হাসি দেবী লেস বুনে চলেন। তপন একটু অস্বস্তি বোধ করে।—কেন মা, ওর সাথে কথা বলি এটা তুমি চাও না?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বোনা বন্ধ রেখে হাসি দেবী তাকান তপনের দিকে। দৃষ্টিতে করুণ চাহনি।

—কি হবে খোকা এসব পাপের মধ্যে গিয়ে? তুই আসার মাস দুয়েক আগে আমরা এসেছি। পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে ওই মেয়েটাই এগিয়ে এলো আলাপ করতে। ভারী ভালো মেয়ে। ভারী সুন্দর। ওর এত বড় সর্বনাশ করলে ভগবান সইবেন না। এ সব কাজ ছেড়ে দেবো বলে যখন মনস্থির করে ফেলেছি, তখন ওকে আর নরকে ঠেলে দেবো না রে।

হাসি দেবীর কথা শেষ হতেই বাইরে গেট খোলার শব্দ হয়। অনিমেষ চক্রবর্তী ঘরে উঁকি দিয়ে বলেন—ইনফরমার সুধীর হালদার আসছে।

তপন আর হাসি দেবী চুপ করে যায়। ঘরে ঢোকে সুধীর। হাসি দেবীর কাছে এক গ্লাস জল চায়। হাসি দেবী বেরিয়ে যেতেই সুধীর বলে —তপনবাবু, কাল ভোরেই আপনাকে কলকাতা চলে যেতে হবে। এখানকার কাজ আপাততঃ বন্ধ থাকবে।

—কেন কি হয়েছে ওদিকে?

—মিঃ বোহরা সন্দেহ করছেন পুলিস লেগেছে আমাদের পেছনে। এখন কিছুদিন চুপচাপ থেকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে হবে।

হাসি দেবী জল নিয়ে ঢোকেন। সুধীর এক চুমুকে জল শেষ করে। তপন জিজ্ঞাসা করে—মিঃ বোহরা কি কাউকে সন্দেহ করছেন?

—সে সব আমাকে তিনি কিছু বলেননি। তবে আমার মনে হচ্ছে মিঃ ট্যাণ্ডন।

মিঃ ট্যাণ্ডনের নামটা কানে যেতেই তপনের শেলীর কথা মনে পড়ে। একটা নিষ্কলুশ গোলাপ ফুল। ওর সহজিয়া আবেদনের কাছে তপন নিজেকে দারুণ ছোট মনে করতো। শঠতার মুখোশ আপনা থেকে টুপ করে খসে পড়ে বেরিয়ে আসতো তপনের মানবিক প্রতিচ্ছবি। কিন্তু মিঃ

বোহরার নির্দেশ অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত এগোতে তপন পারবে। সুতরাং বাধ্য হয়েই তপনকে পিছু হটতে হতো।

— আপনারা দুজনে কালকের দিনটা থেকে পরশু দিন রওনা হয়ে যাবেন। অনিমেষবাবু, আপনি আপাততঃ হাসি দেবীর বাড়িতেই উঠবেন। মেসে ফিরবেন না। পরে আমি আবার আপনাদের খবর দেবো। তপনবাবু, আপনি সোজা সি. সি.-এর গেস্ট হাউসে চলে যাবেন। আমি এক্ষুনি চলে যাবো। আপনাদের কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন।

—এখানকার আবহাওয়া বুঝে আমাদের রওনা হতে হবে! পরশু দিন না পারলে তার পরের দিনও হতে পারে। আপনি মিঃ বোহরাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন। হাসি দেবী অনুরোধের সুরে বলেন।

সুধীর হালদার বেরিয়ে যায়। ওরা তিনজনেই নির্বাক্‌। ঘরের মধ্যে এক অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করতে থাকে।

পরের দিন ভোরবেলা সাজ সাজ রব। হাসি দেবী জলখাবার তৈরি করতে ব্যস্ত। অনিমেষ চক্রবর্তী এ-ঘর ও-ঘরে ঘুরঘুর করছেন। তপন নিজের কিডব্যাগে টুকিটাকি জিনিসপত্র ভরতে থাকে। গোবরডাঙা থেকে প্রথম ট্রেনেই তাকে কলকাতা রওনা হতে হবে। ভেতরে ভেতরে তপন যেন এক পেলব আনন্দ বোধ করে। বার বার মনে হয় এই নোংরা খেলাটা যদি বন্ধ হয়। একটা সত্যিকারের চাকরি। তার পরেই এক নিরুদ্বিগ্ন জীবন। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে একখানা মুখ। তীর ছোঁওয়া ঢেউয়ের মতো এক টুকরো সহজ হাসি। এক টুকরো কথা "আমি আমার বাবার একমাত্র মেয়ে, টাকা পয়সার সমস্যাটা কোন প্রশ্নই নয়।"

কিডব্যাগ কাঁধে নিয়ে হাসি দেবীকে প্রণাম করতেই উনি হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন—আমরা আর কলকাতা ফিরবো না খোকা! তোর দেওয়া ঠিকানায় চিঠি লিখবো। তুই চলে আসিস বাবা।

দু'চোখে জল নিয়ে তপন গেটের কাছে এগিয়ে যায়।

সারাদিন টুকিটাকি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও অনিমেষ বোঝেন হাসির মনে জমে আছে কালো মেঘ। শৈবালের হঠাৎ চলে যাওয়াটা ও এখনও ভুলতে পারে নি। একটু বেলায় স্মৃতি আসে। শৈবালদার হঠাৎ চলে যাবার জন্য অভিযোগ করে। হাসি দেবী ওকে বোঝান—কাল কলেজ

থেকে লোক এসেছিল, খবর দিতে হঠাৎ চলে যেতে হলো। আমারই কি ভালো লাগছে বলো তো?

কিছুক্ষণ পরে গোপাও আসে। শৈবাল চলে গেছে শুনে ওর মুখেও বিষাদের ছায়া নামে। এর কারণ হাসি দেবীর বুঝতে বাকী থাকে না।

সন্ধ্যা নেমে আসে। অনিমেষ চক্রবর্তী ইজিচেয়ার পেতে বসে আছেন বারান্দায়। চোখে উদাস দৃষ্টি। হয়তো গভীরভাবে কিছু ভাবছেন।

—তুমি একটু ভেতরে আসবে? হাসি দেবীর ডাকে বৃদ্ধ নিঃশব্দে উঠে আসে।

—খোকা চলে যাওয়ায় তোমার মন খারাপ লাগছে না? হাসি দেবী প্রশ্ন করে।

এক করুণ হাসি ফুটে ওঠে বৃদ্ধের চোখে। কাছে এসে হাসি দেবীর কাঁধে হাত রেখে বলেন—খোকার চেয়েও খোকার মায়ের জন্য বেশী কষ্ট হচ্ছে। এতক্ষণে আটকে রাখা বাঁধের জল বন্যার মতো বেরিয়ে আসে। হাসি দেবী ঝাঁপিয়ে পড়ে অনিমেষ চক্রবর্তীর বুকে। অনিমেষের স্নেহের হাত ঘুরতে থাকে হাসি দেবীর মাথায়, সারা পিঠে। নির্বাক্ আলিঙ্গন সান্ত্বনার স্পর্শে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

—খোকার মতো তুমিও কোনোদিন আমাকে ফেলে চলে যাবে না তো?

—ছেলে বড় হলে বাপ-মাকে ছেড়ে চলে যায়। তাই বলে স্বামী কখনও স্ত্রী ছেড়ে চলে যেতে পারে? তাহলে সে নিজেই বা বাঁচবে কি করে?

হাসি দেবী আস্তে আস্তে মাথা তোলেন। টেবিলের ওপর রাখা সিঁদুরের কৌটোটা এনে বলেন—এতদিন আমি তোমার সাজা বউ ছিলাম। আজ আমি তোমার সত্যিকারের বউ হতে চাই।

এক প্রচণ্ড শিহরন খেলে যায় অনিমেষ চক্রবর্তীর সারা শরীরে। কাঁপা হাতে ডানহাতের বুড়ো আঙুলে এক বিন্দু সিঁদুর এনে তুলে দেয় হাসি দেবীর সিঁথিতে। বহু বছর আগের একটা ছবি মনের পর্দায় ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে যায়। অনিমেষ যেন আবার যৌবন ফিরে পেতে থাকে। দৃঢ় আলিঙ্গনে হাসি দেবীকে বেঁধে বলে—হাসি গোবরডাঙ্গায় আজ রাতটাই হবে আমাদের ফুলশয্যার রাত। তারপর চলো কালকেই

আমরা বেরিয়ে পড়ি। কাল থেকে আমি আর সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নই। আমি অনিমেষ চক্রবর্তী, আর তুমি আমার স্ত্রী হাসি চক্রবর্তী।

হাসি দেবী চেয়ে থাকেন এক নিথর নিস্পন্দ চোখে। অনিমেষ চক্রবর্তীর মুখখানা আস্তে আস্তে সনৎ আচার্যের মুখের মতো হয়ে যায়। হাসি দেবী অস্ফুট স্বরে শুধু বলেন—তুমি একটু হাসো আমি দেখবো। একটু হাসো…

॥ পঁচিশ ॥

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে বেলা। ঘরের বাইরে পা দিতেই কে যেন পেছন থেকে বলে "কোথায় যাচ্ছ?" চমকে পেছনে তাকায় বেলা। ক্যালেণ্ডারের পাতাটা উড়ছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করে বেলা। বাবার মুখখানা ভেসে ওঠে। রাতে এসেই টেবিলের ওপর রাখা চিঠিখানা পেয়ে সব বুঝতে পারবে। নিজেকে একটু স্বার্থপর মনে হয়। তবু বেলাকে যেতেই হবে।

—কই এসো! শান্ত ডাকে বেলাকে।

বেলা এগিয়ে যায়।

মাঝদিয়া থেকে কলকাতা। গাড়িতে শান্তর পাশে বসে এক প্রবল উত্তেজনা বোধ করে বেলা। সর্বক্ষণ শান্তর কনুইয়ের কাছটা ধরে রেখেছে। মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে শান্ত বলছে—তোমাকে ট্রেনের মধ্যেই আদর করতে ইচ্ছে করছে।

বেলা আলতো করে ওর কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলে —সারাটা জীবনই তো পড়ে আছে আদরের জন্য। কেমন যেন নেশাগ্রস্তের মতো অবস্থা বেলার। ভয় করছে আবার ভালোও লাগছে। রূপ বলেছিল ও মামা-বাড়িতে মানুষ। ওর কেউ নেই। এক দিদি আছে, তারও বিয়ে হয়ে গেছে। বেলা ওর কথায় আশ্বাস দিয়েছিল—কেউ না থাক তোমার আমি তো আছি রূপ। রূপক ওর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে

কেঁদে উঠেছিল। সেই মুহূর্তে রূপকে বেলার একটা অসহায় শিশু মনে হয়েছিল।

শেয়ালদা স্টেশনে গাড়িখানা ঢুকতেই কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে বেলা। গাড়ি থেকে নামবার সময় আবার পেছন থেকে কে যেন বলে "কোথায় যাচ্ছ ?" বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ও ঠিক এমনি একটা স্বর শুনেছিল। রূপকের হাতটা বেলা শক্ত করে চেপে ধরে।

—আমরা কোথায় যাচ্ছি রূপ ?

—আজ রাত্রের মতো এক বন্ধুর বাড়ি। সেখানে অবশ্য তুমি আর আমি আলাদা শোবো। তারপর কাল সকালে কালীঘাট থেকে ঘুরে এসে তোমার পাশে···

ছ্যাঁৎ করে ওঠে বেলার বুক। কি এক অজানা আশঙ্কা ওর বুকে পাক খেয়ে যায়। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—একটা রাত আগে শুলেই বা কি হয়েছে ? কাল সকালেই তো আমাদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। তুমি আলাদা থেকো না লক্ষ্মীটি !

—তুমি না একদম অবুঝ। আচ্ছা চলো তো দেখি। ওরা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

—ট্যাক্সি এগিয়ে চলেছে। বেলার পায়ের কাছে একটা মাঝারি আকারের সুটকেশ। কথায় কথায় শান্ত জিজ্ঞাসা করে—কি এনেছো ওতে ?

—আমার কয়েকটা জামা-কাপড় আর দু' চারখানা ইমিটেশন গহনা।

—তোমার কি মনে হয় তোমাকে দু' চারখানা জামা-কাপড় এবং সোনার গহনা দেবার ক্ষমতা আমার নেই ? অবশ্য বিরাট বড়লোক আমি নই···

—তুমি ওসব বলছো কেন ? বিবাহিতা কোন মেয়ের হাতে গায়ে একটু গহনা না থাকলে লোকে সন্দেহ করবে।

শান্ত চুপ করে যায়। ট্যাক্সি সি. সি. এ.র গেটের ভেতরে ঢোকে। ওদের অভ্যর্থনা জানায় তপন।

—যাক্ এসেছিস তাহলে ! আমি তো তোদের দেরি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আসুন বেলা দেবী ! রাস্তায় কোন কষ্ট হয়নি তো ?

বেলা ঘাড় নেড়ে জানায়—না।

ওরা গেস্ট হাউস নং ১-এ চলে আসে। সেখানে কপালে সিঁদুর দিয়ে অপেক্ষা করছে কুহেলি। এখন সে তপনের স্ত্রী। এই তপনই বিমান সেজে একদিন কুহেলিকে এখানে এনে তুলেছিল। কুহেলির সহজ অন্তরঙ্গ কথাবার্তায় বেলার সংশয় অনেকখানি কেটে যায়।

তপন আর শান্ত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। কুহেলি বলে—ওটি আমার পতিদেবতা।

—না বললেও বুঝতে পেরেছি। বেলা চটুল স্বরে বলে।

—তোমার নাম তো বেলা, না?

—সবই তো জান দেখছি।

—হ্যাঁ। তোমরা আজ আসছো তাও জানি। শুধু জানি না এর পর তুমি কোথায় যাবে। শেষ কথাটা বলার সময় কুহেলির গলার স্বরটা ঈষৎ কেঁপে ওঠে।

দরজার কাছে শান্ত আর তপন এসে দাঁড়ায়। শান্ত বলে—তুমি একটু বৌঠানের সাথে কথা বলো আমি আসছি।

বেলা শঙ্কিত দৃষ্টিতে শান্তর দিকে তাকাতেই কুহেলি তাড়াতাড়ি বলে—রূপকবাবু, আপনার বন্ধুকে বলবেন একদম যেন দেরি না করে। বেলার দিকে চেয়ে খানিকটা সান্ত্বনার সুরে বলে—পুরুষমানুষ তো ঘরে থাকতে চায় না।

শান্ত আর তপন মিঃ বোহরার সাথে দেখা করে। মিঃ বোহরার মুখ থমথমে। গম্ভীর গলায় বলেন—বোসো। তোমাদের দুজনকে আমি একসাথেই আসতে বলছি কারণ আমার সিকস্‌থ্ সেন্স বলছে কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়েছে। ইতিমধ্যে তপনের বন্ধুরা একদিন তপনের ফ্ল্যাটে হানা দিয়েছিল। অবশ্য তপন বলছে ওরা ওর অনেকদিনের চেনা। যাই হোক আজ রাতটা শান্ত বেলার সাথে এবং তপন কুহেলির সাথে থাকবে। তপন, বহুদিন পর কুহেলির সাথে তোমার রাত্রিবাস, সুতরাং একটু বুঝে-সুঝে থাকবে। কাল সকালে তপন চলে যাবে শান্তর ফ্ল্যাটে আর শান্ত আমার অফিসে। কাল সন্ধ্যেবেলা মিঃ সিং আসবেন। বেলাকে পছন্দ হলে আগামী সপ্তাহে উনি বেলাকে নিয়ে দিল্লী চলে যাবেন। তপন, দিনের বেলা শান্তর ফ্ল্যাট থেকে কোথাও বেরোবে না। সন্ধ্যের পর এখানে আসবে, পরবর্তী নির্দেশ দিয়ে দেবো।

—আপনি কি কোন বিপদের আশঙ্কা করছেন? তপন জিজ্ঞাসা করে।

—ইয়েস তপন। এখন আমাদের কিছুদিন সম্পূর্ণ চুপচাপ থাকতে হবে। তাই তোমাকে তাড়াতাড়ি গোবরডাঙ্গা থেকে নিয়ে এলাম। এখন বাকী রইলো বুড়ো বুড়ী। বাই দ্য ওয়ে শান্ত, বেলা তার গহনাগুলো এনেছে কি?

—ও তো বলছে ওগুলো ইমিটেশন।

মিঃ বোহরার মুখে এক অদ্ভুত হাসি খেলে যায়। চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন—ওই ইমিটেশন গহনাগুলোই আমার চাই।

শান্ত আর তপন ফিরে আসে গেস্ট হাউসে। ইতিমধ্যে বেলা আর কুহেলিতে বেশ ভাব হয়ে গেছে। বেলা শাড়ি পালটে নিয়েছে। কুহেলি রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। ওদের দেখেই বেলার মুখে এক স্বর্গীয় হাসি খেলে যায়। শান্ত বোঝে কুহেলি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে ওকে কিছু বুঝিয়েছে। বেলা জিজ্ঞাসা করে—কোথায় গিয়েছিলে?

তপন ওদের কথা বলার সুযোগ দিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

—সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল নিয়ে এলাম।

—এই জান, ওরা আজ আমাদের একসাথে শোওয়াবে।

—আমার নাচতে ইচ্ছে করছে। তোমার তো কোন আপত্তি নেই বললে।

—একদম দুষ্টুমী করবে না কিন্তু। বেলার চোখে মুখে মৃদু হাসির ঢেউ খেলে যায়।

—সেরকম কোন কথা আগে থাকতেই দিতে পারছি না। বেলা, পুরুষসঙ্গ তোমার কাছে নতুন নয়; বলতে পার অনেক দিনের অনভ্যাস। কিন্তু আমার জীবনে তুমি প্রথম।

বেলা আর কোন কথা বলতে পারে না। মুখ নীচু করে থাকে। ভাবতে থাকে, সত্যিই তো রূপ অবিবাহিত। সুতরাং ওর কৌতূহল থাকবেই। কোন অবিবাহিত মেয়ে হলেই বোধ হয় ভালো হতো।

—কি ভাবছো?

শান্তর প্রশ্নে চোখ তোলে বেলা। তুমি না চাইলে কোন দুষ্টুমী করবো না বেলা। কথা দিচ্ছি।

বেলা কি বলতে গিয়েও বলতে পারে না। দরজার কাছে যায় কুহেলির ডাকে।

—এই, এবার তোমরা এসো। অনেক রাত হলো। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো।

নানান রকম হাসি ঠাট্টার মধ্যে ওরা একসাথে খায়। কুহেলির সরস মিষ্টি কথাবার্তায় ডাইনিং-টেবিলে এক সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তপন শুধু ভাবে, কুহেলি এত উচ্ছল কেন ?

—তোমার আর কিছু লাগবে ? একটু মাংস নাও না ?

কুহেলির অনুরোধে তপন দু'টুকরো মাংস নেয়। এক সময় খাওয়া শেষে উঠে পড়ে।

তপন শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছে। কুহেলি চুল আঁচড়াচ্ছে। ঘরময় একটা নিস্তব্ধতা। কি এক সঙ্কোচ আর অপরাধবোধ তপনকে ছেয়ে আছে। ও কোন কথা বলতে পারে না। নিঃশব্দে কুহেলিকে দেখতে থাকে। কুহেলির যেন কিছু বলার নেই। অভ্যস্ত হাতে চুলের জট ছাড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার মাধ্যমে ওদের চোখাচোখি হয়।

বড় আলোটা নিভে যায় পরিবর্তে একটা নীল আবছা আলো ছড়িয়ে পড়ে। ফিকে নীল আলোয় কুহেলিকে যেন এক স্বপ্নরাজ্যের নায়িকা মনে হয়। সারাঘরে একটা মিষ্টি গন্ধ খেলে বেড়াচ্ছে। তপন সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দেয়।

—একটু সরো তো ? কুহেলির অনুরোধে তপন সরে গিয়ে কুহেলিকে পাশে জায়গা করে দেয়।

ওরা পাশাপাশি শুয়ে আছে। কেউ কোন কথা বলছে না। দুজনেই ভাবছে ও আগে বলুক। তপন ভাবে কুহেলির অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। ও কিছু বলুক, অন্ততঃ প্রচণ্ড অপমান করুক তপনকে। তপন পাশ ফেরে। একখানা হাত রাখে কুহেলির বুকের ওপর। অনুভব করে কুহেলির সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। তপন ওকে কাছে টেনে নেয়। ওর আধ-বোজা চোখ দুটো মাঝে মাঝে চকচক করে উঠছে।

—আমার সাথে কথা বলবে না ? তপন গাঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করে।

—তোমাকে কি বলে ডাকবো ? বিমান না তপন ?

তপন স্তব্ধ হয়ে যায়। একটা ছোট্ট কথা যে এত অর্থবহ হতে পারে তপনের জানা ছিল না। নিস্তব্ধ প্রহরের সিঁড়ি বেয়ে রাত বেয়ে চলে।

হঠাৎ তপন প্রশ্ন করে—আমার জন্য তোমার অনেক অভিযোগ জমা হয়ে আছে, তাই না ?

কুহেলি তপনের দিকে পাশ ফেরে। হাতের ওপর মাথা রেখে সোজাসুজি তাকায়।—প্রথম প্রথম তোমার কথা মনে হতো। তারপর বহুদিনের অদর্শনে বুঝলাম তোমার সাথে আর দেখা হবে না। জানো বিমান, বিভিন্ন পুরুষের সান্নিধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে একটা স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের স্বাদ পেয়ে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো নিজের অজান্তেই কখন জমে থাকা জঞ্জালের মতো ত্যাগ করেছি। নিজেকে বুঝিয়েছি একটা পুরুষ আর আমাকে কত স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারতো ! তার চেয়ে এই ভালো ; এখন আমি যে কোন সময় কয়েক হাজার টাকা বার করে দিতে পারি। বিমান, আমাকে এখানে এনে পৌঁছে দেবার জন্য তোমায় কিছু দিতে ইচ্ছে করছে। যাবার সময় আমার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে যেও।

প্রচণ্ড ক্ষোভে তপনের প্রতিটি রোমকূপ রিনরিন করে ওঠে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে—আজ আমায় তুমি টাকা দেখিয়ে অপমান করছো ? কিন্তু তুমি কি জান ? ক'টা টাকার জন্য আমায় কি দুঃসহ অপমান সইতে হয়েছে ? জান কি ক'টা টাকার জন্যই আমার একদিন আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছিল ?

হঠাৎ তপন কুহেলির বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গর্জনের মতো ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—কি ভাবো আমাকে ? আমিও মানুষ। জানো, এই মুহূর্তে তোমার সব কথা আমি স্তব্ধ করে দিতে পারি ? তপনের দু'চোখে আগুন ভেতরে আগ্নেয়গিরির জ্বালা। কুহেলি কিন্তু এতটুকু ভয় পায় না বা চমকায় না। শুধু ভেজা চোখের পাতা দুটো খুলে নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্ত তপনের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর নিতান্ত অবহেলায় তপনকে সরিয়ে দিয়ে বলে—অনেক রাত হয়ে গেছে। ঘুমিয়ে পড়ো।

পাশে শুয়ে একটা বোবা কান্নায় তপনের শরীরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। না, সে কিছুতেই কুহেলির কাছে হারবে না। যে করেই হোক এ কান্না গোপন করতেই হবে। একখানা হাত এসে পড়ে তপনের গালে। আবার ফিরে যায়। এবার হাতখানা আসে আঁচলের খুঁট ধরে। তপনের ভেজা চোখের ওপর খানিকক্ষণ থামে। আবার ফিরে যায়। নিঃশব্দে রাত গড়িয়ে চলে।

॥ ছাব্বিশ ॥

ভোরের ফিকে আলোয় ঘুম ভেঙ্গে যায় শান্তর। অগোছালো বেশবাসে পাশে অঘোরে ঘুমুচ্ছে বেলা। শান্ত চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। মাঝে মাঝে ওর ঠোঁটের কোণে হাসি জেগে ওঠে, আবার মিলিয়ে যায়। স্বপ্ন দেখছে বেলা। গভীর রাত পর্যন্ত নিজেকে উজাড় করে দিয়ে এখন স্বপ্ন দেখছে। নিরাবরণ নিটোল বুক নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ওঠে নামে। ঘুমের ঘোরে ফিসফিস করে বেলা কি যেন বলছে। শান্ত নীচু হয়ে শোনবার চেষ্টা করে।—"অলক, তুমি কি আমাকে পাগল করে দেবে? তোমাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্ত বাঁচবো না অলক।"

একটা বৈদ্যুতিক শিহরন খেলে যায় শান্তর শিরায় শিরায়। বীথিও ওই কথাই বলতো। শান্ত কেমন এক অস্বস্তি বোধ করে। দূর থেকে বীথিকে দেখেছে শান্ত। বীথির সর্বহারা রূপ। অনামিকার আংটিটা একবার ঠোঁটে ছোয়ায়। কি করছে বীথি? এ জীবনটাকে ও কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। নিজেকে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে পাগলের মতো দেওয়ালে মাথা ঠোকে। তবে কি বীথি সত্যই পাগল হয়ে গেল?

বেলা সুখস্বপ্নে বিভোর। শান্ত সন্তর্পণে খাট থেকে নামে। আগুনের মতো যৌবন নিয়ে বেলার নগ্ন শরীরটা পাশ ফেরে। শান্ত পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

নিস্তব্ধ সি. সি. এ.-র গেস্ট হাউস। বাঁদিকে কুহেলির ঘর। তাড়াতাড়ি পেরিয়ে শান্ত অন্ধকার চোরা গলির মুখে এসে দাঁড়ায়। স্যাঁতসেঁতে গলিতে পরিচিত পুরানো বাড়ির গন্ধ। শান্ত সন্তর্পণে এগিয়ে চলে। কেমন যেন গা ছমছমে পরিবেশ। বাঁদিকে বাঁক নেয়। এ গলিটা আগের চেয়েও অন্ধকার। দেয়াল হাতড়ে আলোর সুইচ খোঁজে। হাতের তলায় একটা মাকড়সার বাসা থেতলে যায়। মাথার ওপর বিশ্রীভাবে ডেকে ওঠে টিকটিকি। শান্ত অন্ধকারে এগোতে থাকে।

উত্তেজনায় দেশলাইটা আনতে ভুলে গেছে। তিনখানা ঘর ছেড়ে বীথির ঘর। হ্যাঁ, শেকল তোলা এই ঘরখানাতেই বীথি বন্দী। ও কি ঘুমুচ্ছে? না জেগে আছে? যদি শান্তকে চিনতে না পারে? পারলে কি বলবে? নানান চিন্তা শান্তর মাথায় ভিড় করে। দরজায় কান

পাতে। না, কোন কান্নার শব্দ নেই। কিন্তু এত নিঃশব্দ কেন? ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুকের ভেতরটা। সাবধানে শেকল খোলে। ঘরময় আবছা অন্ধকার। বীথির মাথার কাছের জানালাটা খোলা। বীথি নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। শান্ত পেছনে হাত রেখে দরজা বন্ধ করে দেয়। পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় খাটের দিকে। ক্লান্ত, অসহায় অভিব্যক্তিতে ঘুমিয়ে আছে বীথি। চোখের কোলে গাঢ় কালো দাগ। শীর্ণ হাতদুখানা বুকের ওপর। দেখতে দেখতে শান্তর অনেক কথা মনে পড়ে। সিঁথির দিকে চোখ পড়ে। ক্ষীণ সিঁদুরের রেখাটা একেবারে মুছে যায়নি। টপ টপ করে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে শান্তর চোখ থেকে। মনে মনে বলে—"আমাকে ক্ষমা করো বীথি।" শান্তর চোখের জলের ছোঁয়ায়ই বোধহয় চোখ মেলে তাকায় বীথি। নির্বাক্ দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে থাকে।

শান্ত হাত রাখে ওর কপালে। ভ্রূদুটো কুঁচকে যায়। বাধা যেমন দেয় না তেমনি প্রশ্রয়ও নেই বীথির চাহনিতে।

—আমায় চিনতে পারছো বীথি?

শান্তর প্রশ্নে বীথি মাথা নেড়ে জবাব দেয়—না।

—তোমার অনেক অভিমান জমা হয়ে আছে জানি। তোমাকে আমি সব কিছু খুলে বলবো। এখন সময় নেই। তোমাকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাবো। দূরে বহু দূরে। বীথি, তুমি আমার সাথে আসবে তো?

তিরতির করে বীথির চোখের পাতা কাঁপে। কানের দু'পাশ দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। নাকের দুপাশ ফুলে ফুলে ওঠে। মুখে কোন কথা বলে না। শান্ত কৈফিয়তের সুরে বলে—এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট। তুমি আমি কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। এই দেখ তোমার আংটিটা এখনও আমার হাতে।

বীথির শীর্ণ হাত দুটো কাঁপতে কাঁপতে উঠে আসে। ওর দু'হাতের মধ্যে শান্ত নিজেকে সঁপে দেয়। শান্তকে বুকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে বীথি। কি যেন বলতে থাকে। শান্ত ওর শেষ কথাগুলো শুনতে পায়—আমি ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকি আর বলি, শেষবারের মতো যেন তোমাকে একবার দেখতে পাই। শুভ্রাংশু, আমি নিজেকে শেষ করে এনেছি। আর কিছু চাই না···আর কিছু···। চোখের কোণে জল নিয়ে বীথি শান্তর মুখখানা তুলে ধরে বলে—আমার কোন অভিযোগ নেই শুভ্র।

আমি কুহেলির কাছ থেকে সব শুনেছি। এরা মেয়ে চালান দেয়। আমার ভাগ্য আমাকে এখানে টেনে এনেছে। তোমার তো কোন দোষ নেই!

প্রচণ্ড উত্তেজনায় শান্ত কাঁপতে থাকে। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। ভারী গলায় বলে—তোমার কাছে তো আমি ক্ষমা চাইনি! তুমি আমাকে অভিশাপ দাও, গালাগালি করো, দরকার হলে আমার মুখে থুথু ছেটাও। প্লিজ বীথি, একটা কিছু করো যাতে আমি প্রচণ্ড আঘাত পাই, অপমানে মাথা তুলতে না পারি। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করো না। ক্ষমা আমি চাই না…চাই না…চাই না। হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে শান্ত।

—শুভ, আমি যে শেষ হয়ে গেছি! তুমি আমার স্বামী। তোমাকে সেবা করা, সুখী করা আমার কাজ ছিল। সেটুকু করে যেতে পারলাম না বলেই আমার দুঃখ। শোন, আমি মরে গেলে আমার মাথায় একটু সিঁদুর দিয়ে বলো, "আমি ওর স্বামী" আর তোমার কাছে কিছু চাই না। কি করবো বলো, পুরানো সংস্কার কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারি না।

—বীথি, আজ রাত্রে তোমাকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাবো। বীথি, তুমি আপত্তি করো না প্লিজ…

—আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে? আমি যে সমস্ত পৃথিবীর কাছ থেকে পালিয়ে যাবার ব্রত নিয়েছি শুভ। আচ্ছা শুভ, আমাকে মেরে ফেলে আবার বাঁচাতে চাইছো কেন?

—বীথি, তোমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে বুঝিনি আমিও মরতে চলেছি। তাই তোমাকে বাঁচিয়ে আমিও আবার বাঁচতে চাই বীথি। যেমন করে হোক…

শান্তর কথা শেষ হয় না। বীথি দরজার দিকে চোখ তুলে ইশারা করে।

শান্ত পেছন ফিরে দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কুহেলি। অভিব্যক্তিহীন নিশ্চল মূর্তি যেন। শান্ত মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বেলা ঘুম থেকে উঠে চুপ করে বসে আছে। শান্ত ঘরে ঢুকতেই বিস্ময় মেশানো গলায় জিজ্ঞাসা করে—কোথায় গিয়েছিলে?

—খোলা হাওয়ায় একটু নিশ্বাস নিয়ে এলাম।

—আমাকে ডেকে গেলে না কেন ?

—সারারাতের ক্লান্তিতে তুমি অঘোরে ঘুমুচ্ছিলে। তাই তোমাকে ডাকিনি।

কোন কথা না বলে বেলা বাথরুমের দিকে চলে যায়। শান্তর সামনে ভেসে ওঠে দুটো মুখ। বেলা আর বীথি ? কাকে ভালোবাসে শান্ত ? ওরা দুজনেই শাশ্বত নারীত্বের প্রতীক। একটু ভালোবাসার বিনিময়ে ওরা দুজনেই নিজেদের উজাড় করে দিয়েছে। কোন দুর্বোধ্যতা নেই ওদের মধ্যে। তবু বীথির জন্যেই যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠছে শান্তর মনে। শালগ্রাম শিলা আর অগ্নি সাক্ষী করে যাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছে এটা কি তারই প্রতিক্রিয়া ?

তপনকে উঁকি মারতে দেখে চিন্তায় ছেদ পড়ে শান্তর। বেলাকে দেখতে না পেয়ে ইশারায় জিজ্ঞাসা করে, "কোথায় গেল ?" শান্তও ইশারায় জবাব দেয় "বাথরুমে।" তপন দ্রুতপায়ে ঘরে ঢোকে। নীচু স্বরে বলে—মিঃ বোহরা বলে পাঠিয়েছেন খানিকক্ষণ পরে আপনাকে অফিসের কাজের নাম করে বেরিয়ে পড়তে হবে। মিঃ সিং না আসা পর্যন্ত আপনি গেস্ট হাউসে ফিরবেন না। চলি···তপন দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। শান্ত একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকে।

সদ্যস্নাতা বেলা বেরিয়ে আসে বাথরুম থেকে। অভিনয় করেই শান্ত জড়িয়ে ধরে বেলাকে।

—আঃ, ছাড়ো ছাড়ো। সারারাত দুষ্টুমী করেও হলো না ! প্রশ্রয় মেশানো প্রতিবাদ। ভালো লাগার মিষ্টি অভিব্যক্তি।

—শোন, সকালের দিকে আমি একটু বেরোচ্ছি। বিকেলে বেড়াতে বেরোনোর সময় কালীঘাটে যাবো, কেমন ?

—সকালেই চলো না। কতক্ষণ আর লাগবে ! তারপর তুমি অফিস চলে যেও ! বেলার গলায় আবদারের সুর।

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত বেলাকে রাজী করায়। স্নান সেরে অফিসে বেরোনোর আগে বেলার মুখে শোনা ওর স্বামীর আদরের পুনরাবৃত্তি করে। পরম তৃপ্তিতে বেলা শুধু বলে—তাড়াতাড়ি চলে এসো কিন্তু।

শান্ত বেরিয়ে যেতেই ঘরে ঢোকে কুহেলি। ওর মুখে আগের মতো বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি নেই। তার বদলে কেমন যেন অসৌজন্যভরা রূঢ়তা।

বেলা হাসি মুখে প্রশ্ন করে—কি গো, রাত কেমন কাটলো?

—ভালো। তোমার? তোমাদের তো ফুলশয্যা। আমার চেয়েও তোমার তো আরও ভালো কাটবার কথা।

ঠাট্টার বদলে ঠাট্টা। কিন্তু কেমন যেন প্রাণহীন। বেলার ঘরে বসেই ওরা প্রাতঃরাশ সারে। বেলার মনে হয় কাল রাতের কুহেলির সাথে আজ সকালের কুহেলির যেন অনেক তফাৎ।

খাওয়া শেষ করে কুহেলি কোন ভূমিকা না করে বেলাকে এখানে আনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। বেলা রূপকথার গল্পের মতো কুহেলির কথা শোনে। কি এক দৃঢ়তায় বেলার মুখখানা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে ওঠে—তার মানে তুমি বলছো এখান থেকে বাঁচবার আর কোন পথ খোলা নেই?

—না। কুহেলির সোজা উত্তর।

—কুহেলি, আমিও ডাঃ সান্যালের মেয়ে। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত আমাকে দিয়ে কেউ কিছু করাতে পারেনি। রূপক আসুক। ওর সাথে শেষ বারের মতো একটা কথা বলে আমি আমার কর্তব্য স্থির করে নেবো।

ওর কথায় কুহেলি হাসে। ইশারায় বলে—আমার সাথে এসো।

নিঃশব্দে বীথির ঘরের সামনে গিয়ে কুহেলি বীথিকে দেখায়। সেই সাথে অন্যান্য বন্ধ দরজাগুলো।—এই বন্ধ দরজাগুলো হচ্ছে এক একটা খাঁচা। নতুন পাখি আসার অপেক্ষায় বন্ধ। তারপর সেই সব পাখি অনেক চড়া দামে বিক্রি হবে বিভিন্ন প্রদেশে। এমন কি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক শহরেও।

—ওই মেয়েটি এখানে কি করে এলো?

—যেভাবে তুমি এসেছো। শান্তকে তুমি জান রূপক নামে আর ও জানে শুভ্রাংশু নামে। ওকে এনেছে বিয়ে করে আর তোমাকে বিয়ে না করে। তাই বোধহয় ওর ওপর শান্তর দরদটা একটু বেশী। ভোরবেলা তোমার অজান্তে শান্ত এখানেই এসেছিল। যাই হোক, আমার কর্তব্য তোমাকে জানিয়ে দেওয়া, তাই জানালাম।

বেলা কোন কথা বলে না। নিজের ঘরে ফিরে আসে। কঠিন মুখে

খাটে এসে বসে। কুহেলি বলে—বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেবো। খাবার সময় আবার খুলবো। পালাবার চেষ্টা করলে নিজেরই বিপদ ডেকে আনবে। কেন না এ বাড়ির গোলক ধাঁধায় তুমি কোন পথ খুঁজে পাবে না। আচ্ছা চলি……

—শোন, পালাবার যখন পথ নেই বলছো তখন আর শুধু শুধু তালা লাগাবে কেন? আমি তোমার কাজে একটু সাহায্য করতে পারি?

সন্দিগ্ধ চোখে কুহেলি একবার বেলার দিকে তাকায়। কি যেন ভাবে। বলে—এসো।

কুহেলির পেছন পেছন বেরিয়ে আসে বেলা। কুহেলির ঘরের সামনে বারান্দার রেলিং ধরে একবার আকাশের দিকে তাকায়। একফালি আকাশ। নীচে শান বাঁধানো সিমেণ্টের ওপর খেলা করছে দুটো শালিক। কুহেলি আদেশের সুরে বলে—এসো আমাকে রান্নায় একটু সাহায্য করবে।

—যাচ্ছি। বেলা আর সময় না দিয়ে লাফিয়ে পড়ে নীচে। কুহেলি চিৎকার করে ওঠে। ধরতে এসেও ধরতে পারে না। তপন ছুটে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। রেলিং থেকে নীচে তাকিয়ে দেখে বেলার রক্তাক্ত দেহটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তিনতলা থেকে একতলায়।

খবর পেয়ে ছুটে আসেন মিঃ বোহরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাঃ গুপ্তের নার্সিং হোমে আনা হয়। যিনি মিঃ বোহরার অনেক গোপন কাজের সহায়ক। ডাঃ গুপ্ত চিন্তান্বিত স্বরে বলেন—বেঁচে গেলে কোন ভয় নেই। ভয় মরে গেলে। যাই হোক, এক্ষুনি অন্ততঃ ছ' বোতল রক্তের ব্যবস্থা করুন। একটা অপারেশন করতে হবে।

মিঃ বোহরা নানান জায়গায় খোঁজ করতে থাকেন। কিন্তু সব বৃথা। মিঃ বোহরা টাকার লোভ দেখান, তাতেও কোন ভরসা পাওয়া যায় না। রাগে রিসিভার রেখে মিঃ বোহরা বলেন—রাতারাতি সবক'টা স্কাউণ্ড্রেল একেবারে সাধু হয়ে গেছে।

গুপ্তঘরে সবাইকে ডাকেন মিঃ বোহরা। বসে আছে তপন, শান্ত। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে মিঃ বোহরা বলেন—সুধীরকে খবর দেওয়া হয়েছে। দেখা যাক ও কিছু করতে পারে কি না।

শান্ত মনে মনে ভাবছে রক্ত না পাওয়া গেলেই ভালো হয়। বেলার মৃত্যুতে হয়ত এই খেলা বন্ধ হবে। বেলার এতখানি সাহস চিন্তাই করা যায়নি। কাল সারারাত কত গল্প, কথা। নিজেকে নিঃশব্দে উজাড় করে দিয়ে পরম তৃপ্তিতে যে শান্তর বুকে মাথা রেখেছিল সে আজ…

ঘরে ঢোকে সুধীর হালদার। মিঃ বোহরা লাফিয়ে সুধীরের কাঁধে হাত রেখে বলেন—সুধীর, এক্ষুনি আমার ছ' বোতল রক্ত চাই। যত টাকা লাগে আমি দেবো। মেয়েটাকে বাঁচাতেই হবে।

—প্রতি বোতল কত টাকা অফার দিতে পারি স্যার?

—সুধীর! আমি তোমাকে আপাততঃ দু' হাজার টাকা দিচ্ছি। লাগলে পরে আরও দেবো।

—দিন। সুধীর নির্বিকার ভাবে বলে।

টাকা নিয়ে বাইরে পা বাড়াতেই মিঃ বোহরা প্রায় চিৎকার করে ওঠেন—সুধীর, দেরি করলে কোন লাভ হবে না।

—দেরি হবে না স্যার। আমি দেখছি। সুধীর বেরিয়ে যায়।

মিঃ বোহরাকে কিঞ্চিৎ শান্ত মনে হয়। আপন মনেই বলেন—সুধীরটা কাজের ছেলে। রক্ত আনতে পারলে ওকে বখশিস দিতে হবে।

॥ সাতাশ ॥

সি. সি. এ.র দরজায় লাগানো নোটিশ। অনিবার্য কারণে কসমোপলিটান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন সাত দিনের জন্য বন্ধ। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার সাথে সাথে যে সি. সি.এ কলরবমুখর হয়ে ওঠে, আজ সেখানে এক ভৌতিক নির্জনতা। শান্ত ভেতরে ঢোকে। কোন প্রাণের সাড়া নেই। পায়ে পায়ে মিঃ বোহরার ড্রয়িং রুমের দিকে এগিয়ে যায়। দোতলার করিডোর অন্ধকার। শান্ত আলো জ্বালে। ড্রয়িং রুমের দরজা খোলা কিন্তু ভেতরটা অন্ধকার। শান্ত ড্রয়িং রুমের আলোটাও জ্বেলে দেয়। ঘর শূন্য।

মিঃ বোহরার ঘরের দরজাটাও ভেজানো। মিসেস বোহরার কি শরীর খারাপ? হাত দিতেই দরজা খুলে যায়। অন্ধকার ঘর। শান্ত বাইরে থেকে ডাকে—বৌদি! বৌদি!

কোন সাড়া নেই। কেমন একটা সন্দেহ উঁকি মারে মনের কোণে। না এলেই বোধহয় ভালো হতো। কিন্তু মিঃ বোহরা তো সন্ধ্যেবেলা আসতে বলেছিলেন! তবে কি বেলা মারা গেছে? শান্ত তাড়াতাড়ি টেলিফোনের কাছে এগিয়ে যায়। ডাঃ গুপ্তর নার্সিং হোমে ডায়াল করে। ওপাশে টেলিফোন বেজে যায়, কেউ ধরে না। রিসিভার রেখে দেয় শান্ত। এক অস্বস্তিকর নিঃশব্দতা। হঠাৎ মনে হয় বীথিকে নিয়ে পালানোর এই তো সুযোগ!

বড় বড় পা ফেলে চোরা গলিতে ঢোকে। একটার পর একটা আলো জ্বেলে এগিয়ে যেতে থাকে। বীথিকে নিয়ে সে কোথায় যাবে? বর্ধমান? হ্যাঁ, তাই ভালো। ওর বাবার কাছে সব স্বীকার করবে শান্ত···মনে মনে বলে বী-থি-ই-ই আমি আসছি। তুমি একটু অপেক্ষা করো।

চোরা গলির দু'পাশে ধাক্কা খেতে খেতে শান্ত প্রায় ছুটতে থাকে। অপরিসর ছোট্ট চাতাল। শান্তর মনে হয় কে যেন ওকে অনুসরণ করছে। না, এখন ওসব ভাববার সময় নেই। কুহেলির ঘরে কোন আলো জ্বলছে না। ও বোধ হয় রান্নাঘরে। ভালোই হয়েছে, ওর ব্যস্ততার মধ্যেই সরে পড়তে হবে। কোনদিকে না তাকিয়ে শান্ত তাড়াতাড়ি ডানদিকের চাতাল ধরে এগিয়ে যায়। সন্তর্পণে দরজা খুলে ঢুকে পড়ে। আবার

সেই অন্ধকার চোরাগলি। এ গলিপথ শান্তর কাছে এখন অনেক সুগম। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালতে জ্বালতে শান্ত এগিয়ে চলে।

বীথির ঘরের দরজা। শেকল খুলে ঘরে ঢুকতেই দেখে নিষ্প্রভ আলোয় নির্জীবের মতো পড়ে আছে বীথি। কঙ্কালসার চেহারাটা যেন ধুঁকছে। শান্ত বীথির কপালে হাত রাখে।

—বীথি, চলো, আমি তোমাকে নিতে এসেছি!

—কি হবে আমাকে নিয়ে গিয়ে? তুমি চলে যাও শুভ। আমি আর বাঁচতে চাই না।

—বীথি প্লিজ··· দেরি হয়ে গেলে··· এ সুযোগ আর পাবো না··· বীথি···

—সব পথে কড়া পাহারা। মিঃ বোহরার চোখকে কি ফাঁকি দিতে পারবে?

—বীথি, মিঃ বোহরা যত শক্তিশালীই হন, উনি একজন অপরাধী।

বীথি যেন শান্তর কথা রাখবার জন্যই উঠে বসে। ক্ষীণকণ্ঠে শেষ বারের মতো বলে— তবু একবার ভেবে দেখো।

—যা ভাববার আমার আগেই ভাবা হয়ে গেছে। সময় নষ্ট করো না। এসো আমার সাথে।

বীথিকে নিয়ে শান্ত প্রায় ছুটতে থাকে। কুহেলির ঘরের চাতালের কাছে এসে একবার দাঁড়ায়। কি মনে হতে বীথিকে বলে—একটু দাঁড়াও তো, কুহেলিকে একটা কথা বলে আসি।

কুহেলির দরজা ভেজানো। ধাক্কা দিতেই সপাটে খুলে যায়। ঘরের ভেতরে জমে থাকা হাওয়া যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাসের মতো বেরিয়ে আসে। অন্ধকার ঘর। আলো জ্বালতেই শান্ত চমকে ওঠে। ঘরের মাঝামাঝি কড়িকাঠের সাথে শাড়ি বেঁধে ঝুলছে কুহেলির মৃতদেহ। শান্ত এগিয়ে যায়। ওর ঝুলন্ত পা দুটো জড়িয়ে অস্পষ্ট গলায় বলে— এ তুমি কি করলে কুহেলি? আমি তো তোমাকেও বাঁচাবার কথা ভাবছিলাম।···

চেয়ারটা উলটে পড়ে আছে। টেবিলের ওপর পেপার-ওয়েট চাপা দেওয়া এক টুকরো কাগজ। বিদ্যুতের মতো কাগজখানা তুলে শান্ত পড়তে থাকে—

আমি স্বেচ্ছায় চলে যাচ্ছি। সব কিছু বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকাটা মূল্যহীন মনে হচ্ছিল। বেলার আত্মহত্যা যেন আমারও চোখ খুলে দিলো। ভেবেছিলাম এ নাটকের শেষ দেখে যাবো। হলো না। শান্ত, তোমাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারিনি। এক টুকরো ছোট্ট ঘর, স্বামী আর সন্তানের লোভে আমি এখানে এসে পৌঁছেছিলাম। মুখে যাই বলি না কেন এ জীবনটা প্রতি মুহূর্তে আমি ঘৃণা করতাম। মেনে নেওয়ার মধ্যেও না-মানার একটা কাঁটা আমায় যন্ত্রণা দিতো। তবু শেষবারের মতো একবার তপনকে পেয়েছিলাম। দেখে ভালো লাগলো ও অনুতপ্ত। পৃথিবীর আর কারও কাছে আমার কোন অভিযোগ নেই। কুহেলি।

চিঠিখানা যথাস্থানে রেখে শান্ত ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। দরজার বাইরে দু'চোখে জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বীথি। শান্ত মুখোমুখি হতেই বলে—কুহেলিও চলে গেল?

—হ্যাঁ। চলো আমরাও চলে যাই।

শান্তর সাহায্যে নিজেকে কোন রকমে টেনে হিঁচড়ে চলতে থাকে বীথি। ওরা খিড়কির দরজার কাছে পৌঁছে যায়। দরজা খোলার আগে শান্ত একবার বীথির মুখখানা নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে বলে—তোমাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছি জানি না। তবে আর এক মুহূর্তের জন্যও তোমার কাছছাড়া হবো না। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো বীথি।

বীথি কোন জবাব দেয় না। শুধু জলভরা চোখ মেলে একবার শান্তর দিকে তাকায়।

সাবধানে দরজা খুলে বীথির হাত ধরে শান্ত বাইরে পা দিতেই কতগুলো জোরালো আলো ওদের মুখে এসে পড়ে। সেই সাথে একটা হুঙ্কার—এক পাও নড়বেন না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকুন শান্তবাবু।

দু'পাশ থেকে দুজন এসে শান্তকে ধরে। তারপর একটা কালো গাড়ির দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

লালবাজারের বিরাট একটা ঘরে শান্তকে আনা হয়। সেখানে একটা চেয়ারে মুখ নীচু করে বসে আছে তপন, একপাশে সুধির হালদার। অন্য একটা চেয়ারে মিঃ ট্যাণ্ডন। অনেক অপরিচিত মুখের মধ্যে দুজনকে চিনতে শান্তর ভুল হয় না। তপনের ফ্ল্যাটে ওরাই তপনের বন্ধু হিসেবে

একদিন দেখা করতে এসেছিল। একজন পুলিস অফিসার দাঁড়িয়ে বলেন—তমালবাবু, এবার বলুন আপনি। আমরা খুব উদগ্রীব হয়ে আছি।

তমাল বলতে থাকে—এদের ধরার ব্যাপারে আমাকে সব থেকে সাহায্য করেছে সুবীরবাবু। তারপরেই মিঃ ট্যাণ্ডন। বিয়ে করে বউকে নিয়ে উধাও হবার কয়েকটা ব্যাপার কাগজেও দেখেছেন আপনারা। কেসটা হাতে নিয়ে কোন দিক থেকেই কোন ক্লু পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ একদিন সুবীরবাবু তপনবাবুকে আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে এলো। সুবীর আমার বন্ধু এবং তপনের ব্যাপারটা ও নিজেও জানতো। তপনের চেহারার বর্ণনা কিন্তু আমি আগেই পেয়েছিলাম। সুবীরকে কিছু না জানিয়ে তপনবাবুকে অনুসরণ করে আমি সি. সি.-এর সন্ধান পাই। তারপর অন্যান্য খবর সংগ্রহ করি। ঠিক সেই মুহূর্তে বেলার আত্মহত্যা করার চেষ্টা আমাকে আরও সুযোগ করে দিলো। দলের সবকিছু আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সেখানে থেকেই সুধীর হালদার এবং ডাঃ গুপ্তের সন্ধান পেলাম। তবু আমি হেরে গেছি। মিঃ বোহরাকে এখনও ধরতে পারিনি। আর ধরতে পারিনি একজোড়া বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাকে। মিঃ বোহরার আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট আছে। সুতরাং ভারত ছেড়ে চলে গেলে ওকে আর ধরা যাবে না।

একটা পুরো রাত আমি সি. সি.-এর বিরাট বাড়িখানায় কাটিয়েছিলাম। আবিষ্কার করেছি অনেক চোরাগলি। সেই সাথে কুহেলি আর বীথিকে। আড়ি পেতে বীথি আর কুহেলির কথাবার্তা শুনে আরও অনেক সূত্র পেলাম। দেখলাম শান্ত এবং সুধীর হালদারকে। তবে সুধীর হালদারের এর মধ্যেও খানিকটা কৃতিত্ব আছে। বেলার অপারেশনের সময় ছ' বোতল রক্ত ও-ই যোগাড় করে এনে দিয়েছে। ইনফর্মার সুধীর। প্রত্যক্ষভাবে অপরাধের সঙ্গে জড়িত নয় বলে ওর অপরাধ একটু কম।

—আপাততঃ ওদের হাজতে নিয়ে যাও। পুলিস অফিসার গর্জন করে ওঠেন।

সেই মুহূর্তে দরজার কাছে দেখা যায় শেলী ট্যাণ্ডনকে। অনেকখানি ছুটে এসে ও যেন হাঁপাচ্ছে। ওকে দেখে তপন মাথা নীচু করে। শেলী

তপনের মুখোমুখি দাঁড়ায়। কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলে—অপরাধ করেছো শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। কিন্তু আমার কাছে তুমি অপরাধী নও। আমি জানি কেন তোমাকে এই কাজে নামতে হয়েছিল। তুমি ফিরে এসো তপন। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।

জল গড়িয়ে পড়ে তপনের চোখ দিয়ে। শেলীর দিকে না তাকিয়ে পুলিস অফিসারকে বলে—চলুন মিঃ রায়। আপনাদের বোধহয় দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ওরা বেরিয়ে যায়। সেদিকে চেয়ে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে শেলী।

মিঃ ট্যাণ্ডন ওর মাথায় হাত রেখে স্নেহার্দ্র স্বরে বলেন—চল মা ওরা চলে গেছে।

—শেষ—